Contents

بنغالي

কিতাবুত তাওহীদ

মূল ঃ

শায়খ, ডঃ সালেহ বিন ফওযান আল ফাওযান

অনুবাদ ঃ

ছাঈদুর রহমান

সম্পাদনা ঃ

আবূ রাশাদ আজমাল বিন আব্দুন্ নূর

كتاب التوحيد

تأليف :فضيلة الشيخ د . صالح بن فوزان الفوزان

ترجمة : سعيد الرحمن

راجعه : أبو رشاد أجمل بن عبد النور
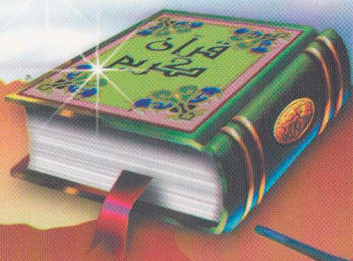
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات في غرب الديرة

Contents

كتاب التوحيد

تأليف:

فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان

কিতাবুত্ তাওহীদ

মূল

শায়খ, ডঃ সালেহ বিন ফওযান আল ফাওযান

ترجمة:سعيد الرحمن

ليسانس: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

অনুবাদঃ

ছাঈদুর রহমান

লিসান্স মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

مراجعة:

أبو رشاد أجمل عبدالنور

ليسانس: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

সম্পাদনাঃ

আবু রাশাদ আজমাল বিন আব্দুন্ নূর

লিসান্স মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ মোহাম্মাদ আব্দুল ওয়াসে

صف و ترتيب: محمد عبدالواسع

ح المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالقويعية ،١٤٢٣هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الفوزان ، صالح بن فوزان

كتاب التوحيد / ترجمة سعيد الرحمن

... ص ؛ ... سم

ردمك : ٧-١-٩٢٠٩-٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١-التوحيد ٢- الألوهية أ- سعيد الرحمن (مترجم)

ب-العنوان .

ديوي : ٢٤٠ ٢٣/٠٣٧٠

رقم الإيداع : ٢٣/٠٣٧٠

ردمك : ٧-١-٩٢٠٩-٩٩٦٠

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুনাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি।

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালন কর্তা। দরূদ ও সালাম তাঁর সত্যবাদী আমানতদার নাবী, যিনি আমাদের নিকট নাবী হিসেবে প্রেরিত হযরত মুহাম্মাদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সমস্ত সাহাবীগণের উপর বর্ষিত হোক।

অত:পর এই বইখানা একাত্ববাদরে জ্ঞান বিষয়ে, যাকে সহজ ব্যাখ্যাসহ সংক্ষেপ করতে চেষ্টা করেছি। আর এই জ্ঞান আহরণ করেছি আমাদের সুযোগ্য মনীষীদের বিভিন্ন মূল গ্রন্থ থেকে- বিশেষ করে শাইখুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়্যা, আল্লামা ইবনুল কায়্যিম এবং শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ যাঁরা পবিত্র দাওয়াতের অগ্রদূত, তাঁদের সকলের গ্রন্থমালা থেকে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নিশ্চয় ইসলামী আক্বীদার জ্ঞানই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান, যা শিক্ষা গ্রহণ করা, শিক্ষা প্রদান করা ও তার দাবী অনুযায়ী আমল করার উপর গুরুত্ব দেয়া বাঞ্ছনীয়, যাতে করে আমলসমূহ সঠিক হয়, আল্লাহর নিকট গৃহীত হয় ও আমলকারীদের জন্য হয় উপকারী। বিশেষ করে আমরা যে যুগ সন্ধীক্ষণ অতিক্রম

করছি এ যুগে বিভিন্ন ভ্রান্তি প্রবনতা বেড়ে চলেছে। যেমন নাস্তিকতা প্রবণতা, সূফীবাদ-বৈরাগ্যবাদ প্রবণতা, কবর পূজা প্রবণতা, বিদআত (নতুন প্রথা) প্রবণতা যা নবীজীর সুন্নাতের পরিপন্থী। যার সকল প্রবণতাই মারাত্মক বিপজ্জনক, যদি মুসলমান সঠিক আক্বীদার অস্ত্রে সজ্জিত না হয়। যা কিতাব ও সুন্নাহ ভিত্তিক এবং যার উপর পূর্বসূরী সালফে সালিহীন প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তা না হলে তাকে এ সকল ভ্রান্ত প্রবণতাসমূহ তৃণলতার ন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। আর এটাই মুসলিম সন্তানদের বিশুদ্ধ আক্বীদা যা মূল গ্রন্থসমূহ থেকে চয়নকৃত, তা শিক্ষা দেয়ার পূর্ণ গুরুত্ব দেয়ার দাবী রাখে।

আমাদের নাবী হযরত (ﷺ) তাঁর পরিবারবর্গ ও সমস্ত সাহাবীবর্গের উপর দরূদ বর্ষিত হোক।

গ্রন্থকার

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানব জীবনের পথ ভ্রষ্টতা

আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইবাদতের জন্য মাখলুককে (মানবজাতি) সৃষ্টি করেছেন এবং ইবাদত করতে তাদের জন্য জীবিকার যাবতীয় মাধ্যম সৃষ্টি করে রেখেছেন। আল্লাহ তায়ালা এ মর্মে বলেন:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ (الذاريات: ٥٦ -٥٨)

অর্থ: আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মাবন ও জ্বিন জাতি সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে জীবিকা চাই না এটাও চাইনা যে তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। আল্লাহ তায়ালাই তো জীবিকা দাতা শক্তির আধার পরাক্রান্ত। সূরা যারিয়াত: ৫৬/৫৮)

আত্মাকে স্বভাবগত ভাবে যখন ছেড়ে দেয়া হয়, তখন সে আল্লাহকে ইলাহ বা মাবুদ হিসেবে স্বীকার করে নেয়, আল্লাহর ভালবাসায় তাঁর ইবাদত করে, তাঁর সাথে কোন জিনিষকে শরীক করে না। কিন্তু জ্বীন ও ইনসানের মধ্যেকার শয়তানরা যারা একে অপরকে বাক-চাতুর্য্য দ্বারা ধোকা দেয়, তারা তাকে নষ্ট করে এবং উহা হতে সরিয়ে দেয়। সুতরাং স্বভাবগত ভাবে একতত্ববাদ অন্তরে বদ্ধমূল থাকে। আর শিরক

হচ্ছে এমন বস্তু যা নতুন ভাবে ইহার ভিতর অনুপ্রবেশ করে। এর প্রমাণে আল্লাহর বাণী:

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ (سورة الروم: ٣٠)

অর্থাৎ তুমি একনিষ্ঠ ভাবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি; যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। (সূরা রূম:৩০)

আর নাবী ﷺ বলেছেন:

وَقَـــالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِــهِ أَوْ يُنَصِّــرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ (في الصحيحين من حديث أبي هريرة)

অর্থাৎ, প্রতিটি শিশু ইসলামী ফিতরাতের উপর জন্ম গ্রহণ করে, অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী বানায়, অথবা খৃষ্টান বানায়, কিংবা অগ্নিপূজক বানায়। (আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه হতে বুখারী, মুসলিমে বর্ণিত)

অতএব আদম সন্তানের মূলে রয়েছে একত্ববাদ। আর দ্বীন ইসলাম হযরত আদম عليه السلام এর যুগ থেকে শুরু করে তার পরবর্তি সন্তানদের মাঝে সূদীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে চালু ছিল। এই মর্মে আল্লাহ প্রমাণ করেছেন:

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾(البقرة:٢١٣)

অর্থাৎ সকল মানুষ এক জাতি সত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল, এরপর আল্লাহ তায়ালা পয়গাম্বর পাঠালেন, সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে। (সূরা বাকারা:২১৩)

আর সর্ব প্রথম শিরক এবং আক্বীদার পরিবর্তন ঘটে নূহ (عليه السلام) এর গোত্রের মাঝে, সেজন্য তিনি সর্বপ্রথম রাসূল হিসেবে প্রেরিত হন, আল্লাহ বলেনঃ

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ﴾(النساء:١٦٣)

অর্থাৎ আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি যেমন করে ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহের প্রতি এবং সমস্ত নাবী- রাসূলের প্রতি যারা তাঁর পরে প্রেরিত হয়েছেন। (সূরা নিসা: ১৬৩)

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন: আদম এবং নূহ (عليه السلام) উভয়ের মধ্যেকার (আবির্ভাবের) ব্যবধান দশ শতাব্দি ছিল। তারা সকলেই ছিল ইসলামের উপর। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম বলেন: (এগাসাতুল্ লাহফান ২/১০২) যে একথাটি নিঃসন্দেহে সঠিক; সূরা বাকারার একটি আয়াতে উবায় ইবনে কা'বের কেরাত রয়েছে এরূপ: فَاخْتَلَفُوْا فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّيْنَ এই কেরাতকে সমর্থন করছে আল্লাহর নিম্নোক্ত আয়াতটি

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواْ﴾ (يونس: ١٩)

অর্থাৎ আর সমস্ত মানুষ একই উম্মতভুক্ত ছিল, পরে পৃথক হয়ে গেছে (সূরা ইউনুস: ১৯)

তিনি (ইবনুল কাইয়্যিম) (রহ:) বলতে চান যে, নাবী প্রেরণের একমাত্র কারণ ছিল তৎকালিন লোকদের কর্তৃক সঠিক ধর্মের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি করা, যেমন আরবের লোকেরা উহার পরে হযরত ইব্রাহীম (عليه السلام) এর দ্বীনের উপর ছিল আমর বিন লোহাই আল খুযায়ীর আগমণ পর্যন্ত। অত:পর সে দ্বীনে ইব্রাহীমকে পরিবর্তণ করে দেয়, এবং আরব ভূখণ্ডে ও হেজাযের ভুমিতে বিশেষ আকৃতির মূর্তি আমদানী করে । অত:পর আল্লাহ ব্যতীত ঐগুলির ইবাদত করা শুরু হয় এবং এই পবিত্র দেশসমূহে ও তার পার্শ্ববর্তি দেশসমূহে শিরক ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) কে প্রেরণ করা পর্যন্ত এই ভাবে শিরক ছড়াতে থাকে। এরপর তিনি (ﷺ) মানুষকে একত্ববাদের পথে এবং ইব্রাহীম (عليه السلام) এর দ্বীনের অনুসরণের দিকে আহবান জানান। আর আল্লাহর পথে সঠিক ভাবে জিহাদ করেন। ফলে একত্ববাদের বিশ্বাস ও ইব্রাহীম (عليه السلام) এর শরীয়ত পূনরায় ফিরে আসে এবং তিনি সমস্ত মূর্তিকে ভেঙ্গে দেন। আর আল্লাহ তাঁর মাধ্যমেই জগতের উপর নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করেন। আর এই উম্মতের শুরু লগ্ন হতে তিনটি

সোনালী যুগ তাঁর (ﷺ) সঠিক তারিকার উপর চলে। এর পরবর্তি যুগে অজ্ঞতা ছড়িয়ে পড়ে এবং অন্যান্য মতাদর্শ এতে অনুপ্রবেশ করে। তারপর এই উম্মতের অনেকের কাছে শিরক ফিরে আসে পথভ্রষ্ট আহ্বানকারীদের কারণে এবং কবরের উপর ঘর তৈরী, আওলিয়া ও নেককার লোকদের সম্মানার্থে প্রতিকৃতি তৈরী এবং তাদেরকে ভালবাসা জরুরী বলে দাবী করে। এমনকি তাদের কবরের উপর পাথর খচিত কারুকার্য সম্পন্ন করে বিল্ডিং বানানো হয়। এবং মূর্তি বানিয়ে নৈকট্য লাভের মাধ্যমসমূহ দ্বারা তাদের স্থানসমূহে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে নিম্নের ইবাদতসমূহ করা হয়। যথা: দোয়া করা, উদ্ধার চাওয়া, যবেহ করা, নজর নেওয়াজ উপস্থাপন করা এবং শিরককে নেককার লোকদের অসিলা গ্রহণ এবং তাদের ভালবাসার বহিঃপ্রকাশের নামে আখ্যায়িত করে এবং তাদের ধারণা মতে এদের জন্য ইবাদত নয় বলে দাবী করে। আর এ কথা ভুলে যায় যে, পূর্বযুগের মুশরিকদের কথা ইহাই ছিল। তারা বলত:

﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ (الزمر:٣)

অর্থাৎ আমরা তাদের ইবাদত এই জন্যই করি যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। (সূরা যুমার-৩)

আর প্রাচীনকালে ও বর্তমান কালের মানবজাতীর মধ্যে শিরক

সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যেকার অধিকাংশ মানুষ, তাওহীদুর রুবুবিয়্যার প্রতি ঈমান আনে। তারা একমাত্র ইবাদতের মাধ্যমে শিরক করে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُون ﴾ (يوسف:١٠٦)

অর্থাৎ অনেক মানুষ আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথেসাথে শিরক করে । (ইউসুফ: ১০৬)

আর মানুষের মধ্যেকার খুব কম সংখ্যক লোকই রব এর অস্তিত্তকে অস্বীকার করেঃ যেমন ফেরাউন, নাস্তিক বাদীগণ ও এ যুগের সাম্যবাদীগণ। আর তারা রবকে অহংকারের বশবর্তি হয়ে অস্বীকার করে। অন্যথায় তারা তাঁকে বাধ্যতামূলক আন্তরিকভাবে স্বীকার করে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴾ (النمل: ١٤)

অর্থাৎ তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তরে এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। (সূরা নামল ১৪)

আর তাদের বিবেক বুদ্ধি জানে যে প্রতিটি মাখলূক বা সৃষ্টির জন্যে সৃষ্টিকর্তা হওয়া আবশ্যক, আর প্রতিটি অস্তিত্তের আবিষ্কারক হওয়া জরুরী।

আর সৃষ্টি জগতের নেজাম সূক্ষ্ম, শৃঙ্খলিত, এর জন্য মহাজ্ঞানী মহাশক্তিধর প্রজ্ঞাময় একজন পরিচালক হওয়া
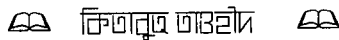
আবশ্যক। যে ব্যক্তি একে অস্বীকার করে সে হয়ত বিবেক হারিয়েছে অথবা সে এমন অহংকারী যে, তার জ্ঞানকে অকেজ করে দিয়েছে, আর নিজকে বেওকুফ বানিয়েছে ফলে এ থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করা সমীচিন নয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিরক এবং তার পরিচয় ও প্রকারভেদ

(ক) শিরকের পরিচয়ঃ তাহল প্রতিপালন ও ইবাদতবন্দেগীর ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্য কোন জিনিসকে আল্লাহর অংশীদার স্থাপন করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উলুহিয়্যাহ বা দাসত্বের ব্যাপারে অংশীদার সাব্যস্ত করা হয়ে থাকে। এভাবে যে, আল্লাহর সাথে অন্যকে আহবান করা অথবা বিভিন্ন প্রকার ইবাদতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যেমন যবেহ করা, নযর বা মান্নত মানা, ভয় করা, আশা করা এবং ভালবাসা। আর শিরকই হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাপ। উহা কয়েক কারনেঃ

একঃ কেননা শিরকের মাধ্যমে আল্লাহর বৈশিষ্টসমূহে সৃষ্টিকর্তার সাথে সৃষ্টিকুলকে স্বাদৃশ নির্ধারণ করা হয়। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে সে তাকে তাঁর

সাথে স্বাদৃশ্য স্থাপন করে। আর তা সব চেয়ে বড় জুলুম। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (لقمان:١٣)

অর্থাৎ নিশ্চয় শিরক হল বড় অত্যাচার। (লুকমানঃ ১৩)

আর জুলুম হল এমন একটি বস্তু, যাকে স্বীয় স্থানে না রেখে অন্যত্র রাখা হয়। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করল তবে সে ইবাদতকে যথাস্থানে রাখল না এবং অন্যের অধিকার ব্যয় করল, আর উহা মারাত্মক জুলুম।

দুইঃ মহান আল্লাহ জানাচ্ছেন যে, যে ব্যক্তি শিরক হতে তাওবা করবে না তাকে ক্ষমা করবেন না। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء ﴾

(النساء:٤٨)

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যে লোক তার সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। (সূরা নিসাঃ৪৮)

তিনঃ আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি মুশরিক এর উপর জান্নাত হারাম করেছেন, আর সে সর্বদা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ বলেনঃ

﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ (المائدة: ٧٢)

অর্থাৎ নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারিদের কোন সাহায্যকারী নেই।(মায়িদাহঃ ৭২)

চারঃ শিরক পূর্বের যাবতীয় আমল নষ্ট করে দেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ (الأنعام: ٨٨)

অর্থাৎ যদি তারা শিরক করত তবে তাদের কাজ কর্ম ব্যর্থ হয়ে যেত। (আনআমঃ ৮৮)

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (الزمر: ٦٥)

অর্থাৎ আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তিদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহর শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্থদের একজন হবেন। (সূরা যুমারঃ৬৫)

পাঁচঃ মুশরিকের রক্ত ও অর্থ হালাল। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾ (التوبة:٥)

অতঃপর (নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে) মুশরিকদের হত্যা কর। যেখানে তাদের পাও; তাদের বন্দী কর অবরুদ্ধ কর। আর প্রত্যেক ঘাটিতে তাদের সন্ধানে ওঁত পেতে বসে থাক। (সূরা তাওবাঃ৫)

আর নাবী কারীম (ﷺ) বলেছেনঃ

قَـالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَإِذَا قَالُوْهَا عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَائَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا)

(رواه البخاري ومسلم)

অর্থাৎ আমি মানুষের সাথে লড়াই করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ পর্যন্ত একথা না বলবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই। যখন তারা একথা বলবে, তখন যেন তারা আমার নিকট থেকে তাদের রক্ত ও ধন সম্পদ বাচিয়ে নিল। কিন্তু অন্য কোন কারণে ইসলামের দন্ডবিধি যদি তাদের উপর প্রযোজ্য হয়, তবে সেটা ভিন্ন কথা। (বুখারী, মুসলিম)

ছয়ঃ শিরক বড় গুনাহের একটি- রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: (اَلإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ)(رواه البخاري ومسلم)

অর্থাৎ আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে সংবাদ দিব না? আমরা (সাহাবীরা) বললাম, নিশ্চয় হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল ﷺ বললেন আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং পিতা- মাতার অবাধ্য হওয়া। (বুখারী, মুসলিম)

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম বলেনঃ (আল জাওয়াবুল কাফী পৃষ্ঠাঃ ১০৯) পবিত্র আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ কর্তৃক মানব সৃষ্টি ও তাকে নির্দেশ দানের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে সে নাম ও গুনাবলীসহ তাঁকে চিনবে এবং তাঁর এককভাবে ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন জিনিস শরীক করবে না। আর মানুষ ইনসাফ কায়েম করবে, আর এটাই হল আদল-ইনসাফ যা নিয়ে আকাশ ও পৃথিবীসমূহ কায়েম রয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ (الحديد:٢٥)

অর্থাৎঃ আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়-নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। (সূরা হাদীদঃ২৫)

তাই পবিত্র আল্লাহ তায়ালা আরও জানিয়ে দিয়েছেন; যে তিনি তাঁর রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে করে মানুষ ন্যায়নীতি

প্রতিষ্ঠা করে। আর এটাই হল আদল। আর বড় ইনসাফ হল তাওহীদ বা একত্ববাদ। ইহাই হল ইনসাফের মূল মানদণ্ড। আর শিরক নিঃসন্দেহে জুলম। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (لقمان: ١٣)

অর্থাৎঃ নিশ্চয় শিরকই বড় জুলুম। (সূরা লুকমানঃ১৩)

সুতরাং শিরক সব চেয়ে বড় জুলুম আর তাওহীদ সব চেয়ে বড় ইনসাফ। তাই এ উদ্দেশ্যের যা চরম পরিপন্থী তাই মহা পাপ। শেষ পর্যন্ত বলেছেন, শিরক যখন এই উদ্দেশ্যেরও সরাসরি পরিপন্থী, তখন এটা সাধারণভাবে সর্বাপেক্ষা কবিরা গুনাহ হিসেবে গণ্য হবে। আর প্রত্যেক মুশরিকের জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করেছেন এবং তাওহীদ পন্থীদের জন্য তাদের রক্ত, সম্পদ ও তাদের পরিবার পরিজনকে হালাল করেছেন। আর আল্লাহর দাসত্ব কায়েম না করার কারণে এদেরকে তাদের দাস বানানো ও হালাল করেছেন। আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের কোন আমল গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। এমনিভাবে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করবেন না এবং পরকালে তার কোন আবেদন এবং আকাঙ্খাও গ্রহণ করবেন না। কারণ মুশরিক ব্যক্তি আল্লাহর ব্যাপারে অজ্ঞ। কেননা তার সৃষ্টির মধ্য থেকে অংশীদার স্থাপন করে। আর উহা তাঁর (আল্লাহর) মর্মে চরম মূর্খতা। যেমন তার মর্মে সীমাহীন

অন্যায়, অথচ মুশরিক ব্যক্তি বাস্তবে তার প্রভুকে জুলুম না **করে** একমাত্র সে নিজেকেই অত্যাচার করে।

সাতঃ নিশ্চয় শিরক হল এমন জিনিষ যা পূর্ণকে ঘাটতি ও ত্রুটিযুক্ত করে। পবিত্র প্রতিপালক এ দুই থেকে নিজকে সম্পুর্ণ মুক্ত রেখেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক স্থাপন করে,সে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এমন সমকক্ষ করে যা থেকে তিনি সম্পুর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। আর এটাই হল আল্লাহর সাথে চরম শত্রুতা এবং সীমাহীন বিরুদ্ধাচরণ ও বিরুধীতা।

শিরকের প্রকার ভেদঃ

ইহা দুই প্রকার ঃ

প্রথম প্রকারঃ বড় শিরক যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় আর মুশরিক ব্যক্তি যদি তাওবা না করে মৃত্যু বরণ করে তবে তাকে সর্বদা জাহান্নামের আগুনে শাস্তি ভোগ করতে হবে । আর বড় শিরক হলঃ ইবাদতের কোন জিনিষ বা কর্ম আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও জন্য করা, যেমন আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে দোয়া করা , নৈকট্য লাভের জন্য কুরবানী করা, কবর, জিন ও শয়তানের নামে মানত করা।

আর মৃত ব্যক্তি অথবা জ্বিন কিংবা শায়তানদেরকে ভয় করা যে, তাদেরকে ক্ষতি করবে অথবা তাদেরকে অসুস্থ করবে, আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও কাছে কোন কিছু

আশা করা। যে আল্লাহ ছাড়া কোন প্রয়োজন মিটাবার ক্ষমতা রাখেনা ও বিপদ মুক্তিরও ক্ষমতা রাখে না। যা বর্তমানে ওলী ও নেককার লোকদের কবরের চার পার্শ্বে প্রচলিত আছে। মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ ﴾ (يونس: ١٨)

অর্থাৎ, আর তারা উপসনা করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর, যা না তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে, আর না লাভ করতে পারে এবং বলেঃ এরাতো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। (সূরা ইউনুসঃ১৮)

দ্বিতীয় প্রকারঃ শিরকে আসগার বা ছোট শিরক। এমন শিরক যা মানুষকে ইসলামী মিল্লাত থেকে বের করে না। কিন্তু একত্ববাদে ঘাটতি হানে। আর ইহা বড় শিরক করার একটি মাধ্যম। ইহার আবার দুটি ভাগ । যথা:

এক: প্রকাশ্য শিরক: ইহা কথা ও কাজে সংঘটিত হয়। কথায় শিকর হল: আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা। নাবী কারীম ﷺ বলেছেন:

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ)

(رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করল সে

Contents

আল্লাহর সাথে কুফরী অথবা শিরক করল। (তিরমিজী বর্ণনা করে হাসান বলেছেন ও হাকীম ছহীহ বলেছেন)

আর এমন কথা বলা যে, ما شاء الله وشئت আল্লাহ এবং আপনি যা চেয়েছেন, যখন কোন ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর উদ্দেশ্যে বলল (ما شاء الله وشئت) আপনি এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন) তখন রাসূল ﷺ বললেন: أجعلتني لله نداً তুমি কি আল্লাহর সাথে আমাকে শরীক করে ফেললে? তুমি বল: قل ما شاء الله وحده আল্লাহ এককভাবে যা ইচ্ছা করেছেন। (নাসাঈ) আরো একটি কথা لولا الله وفلان আল্লাহ এবং অমুক যদি না হতো। সঠিক এভাবে বলা যেতে পারে আল্লাহ অত:পর অমুক যদি না হতো ما شاء الله ثم فلان . لولا الله ثم فلان আল্লাহ অত:পর অমুক কেননা ثم বিলম্বসহ তারতীবের জন্য ব্যবহৃত হয়। বান্দার ইচ্ছাকে, আল্লাহর ইচ্ছার পরে করতে হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (التكوير: ٢٩)

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অভিপ্রায়ের বাহিরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না। (সূরা তাকবীরঃ ২৯) আর واو অক্ষরটি কেবলমাত্র একত্রিত করা ও অংশীদারীত্ব অর্থ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, যা দ্বারা ক্রম
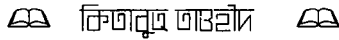
অর্থ বুঝায়না এবং পরের অর্থটি প্রকাশ করে না।

ইহার উদাহরণ হলঃ مالي إلا الله وأنت অর্থাৎ আল্লাহ ও তুমি ছাড়া আমার কিছুই নেই, هذا من بركة الله وبركتك অর্থাৎ ইহা তোমার এবং আল্লাহর বরকতে।

আর কর্মের শিরক: যেমন বিপদ দূর করা ও প্রতিহত করার জন্য সূতা ও কড়া ব্যবহার করা। আরো যেমন বদনজর ইত্যাদী থেকে বাচার জন্য ভয়ে তাবিজ- কবজ ঝুলানো। যখন কোন ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাস করবে যে, এই সকল বস্তু বালা মুছিবত দূর করা ও প্রতিহত করার মাধ্যম, তখন ইহা হবে ছোট শিরক। কেননা আল্লাহ তায়ালা এইগুলি ঐ কাজের মাধ্যম হিসেবে তৈরী করেননি। আর যখন এরূপ বিশ্বাস করবে যে এ সমস্ত বস্তু সরাসরি বালা মুছিবত দূর করতে ও প্রতিহত করতে সক্ষম , তখন এ আক্বীদা বা বিশ্বাসই হবে শিরকে আকবার (বড় শিরক)। কেননা সে আল্লাহ ব্যতীত ঐ বস্তুর উপর নির্ভর করেছে।

ছোট শিরকের দ্বিতীয় ভাগ: গোপন শিরক: شرك خفي আর এ সমস্ত শিরক হয় ইচ্ছা ও নিয়্যাতের দ্বারা । যেমন লোক দেখানো ও সুখ্যাতি বা সুনামের জন্য কোন কাজ করা, তা এভাবে সংঘটিত হয় যে কোন ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের আমল দ্বারা সে মানুষের প্রশংসা পাওয়ার আশা করে। যেমন সে নামাজ সুন্দর করে আদায় করে অথবা

এজন্য সাদকা করে যে, মানুষ যেন তার প্রশংসা ও সুনাম করে। অথবা জোরে জোরে যিকির আযকার করে, সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করে, যেন মানুষ তার কণ্ঠ শুনতে পায় এবং তার প্রশংসা বর্ণনা করে। আর লোক দেখানো কাজ এমন বস্তু যা মানুষের কোন আমলে মিশলে ঐ আমলকে বিনষ্ট করে দেয়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন;

﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءِ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ الكهف: ١١٠)

অতএব যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে। (সূরা কাহাফ:১১০)

আর নাবী ﷺ বলেছেনঃ

وَقَـــالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ اَلشِّرْكُ الْأَصْـــغَرُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالَ : اَلرِّيَاءُ) (رواه أحمد والطبراني والبغوي في شرح السنة)

অর্থাৎ আমি তোমাদের উপর সবচেয়ে ভীতিপ্রদ যে বস্তুর ভয় করছি, তা হল শিরকে আসগার বা ছোট শিরক। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ছোট শিরক কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ লোক দেখানো কোন কাজ। (আহমদ, তাবারানী ও বাগভী - শরহুস্ সুন্নাহ গ্রন্থে) আর এর

অন্তর্ভুক্ত রয়েছে দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করা, যেমন কোন ব্যক্তি হজ্জ করে, অথবা আজান দেয়, অথবা মানুষের ইমামতি করে অর্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে। অথবা শরীয়তের জ্ঞান অন্বেষন করে অথবা জিহাদ করে অর্থ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে।

নাবী ﷺ বলেছেনঃ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (تعس عبد الدينار و تعس عبدالدرهم وتعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط) (رواه البخاري)

অর্থাৎ দ্বীনার ও দিরহাম (টাকা পয়সার) পুজারীরা ধ্বংশ হোক। রেশম পূজারী পোষাক বিলাশী ধ্বংশ হোক। তাকে দিতে পারলেই খূশী হয়, না দিতে পারলে রাগান্বিত হয়। (বুখারী)

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه فمن أراد بعلمه غير وجه الله ونوى شيئاً من غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته و إرادته – والإخلاص أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وإرادته ونيته – وهذا هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم، ولا يقبل

مـــن أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام كما قال الله تعالى ﴿ومن يبتغ غـــير الإســـلام ديـــناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾ (آل عمران:٨٥) وهي ملة إبراهيم ﷺ التي من رغب عنها فهو من السفهاء .

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ) বলেন, ইচ্ছা এবং নিয়্যাতের দ্বারা যে শিরক হয় উহা এমনি এক সাগর যার কুল কিনারা নেই, আর খুব কম সংখ্যক লোক এ থেকে বেচে থাকতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি তার আমল দ্বারা আল্লাহকে সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কিছু পেতে চায়, এবং আল্লাহর নৈকট্য ব্যতীত অন্য কোন কিছুর নিয়্যত করে আর তা থেকে বিনিময় চায়, তবে সে তার নিয়্যাত ও ইরাদায় শিরক করল। পক্ষান্তরে ইখলাস (একনিষ্ঠতা) হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য থাকবে তার কাজে, কথায়, ইচ্ছা এবং নিয়্যাতে। আর ইহাই হলো ইব্রাহীম ﷺ অবলম্বিত একাগ্রতাপূর্ন ধর্ম যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর সকল বান্দাদেরকে পালন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আর উহা ব্যতীত কারো আমল কবূল করবেন না। আর উহাই প্রকৃত ইসলাম। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

﴿وَمَـــن يَبْـــتَغِ غَـــيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (آل عمران: ٨٥)

অর্থাৎ যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে

অন্তর্ভুক্ত রয়েছে দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করা, যেমন কোন ব্যক্তি হজ্জ করে, অথবা আজান দেয়, অথবা মানুষের ইমামতি করে অর্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে। অথবা শরীয়তের জ্ঞান অন্বেষন করে অথবা জিহাদ করে অর্থ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে।

নাবী ﷺ বলেছেনঃ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (تعس عبد الدينار و تعس عبدالدرهم وتعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط) (رواه البخاري)

অর্থাৎ দ্বীনার ও দিরহাম (টাকা পয়সার) পুজারীরা ধ্বংশ হোক। রেশম পূজারী পোষাক বিলাশী ধ্বংশ হোক। তাকে দিতে পারলেই খূশী হয়, না দিতে পারলে রাগান্বিত হয়। (বুখারী)

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه فمن أراد بعلمه غير وجه الله ونوى شيئاً من غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته و إرادته – والإخلاص أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وإرادته ونيته – وهذا هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم، ولا يقبل

مــــن أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام كما قال الله تعالى ﴿ومن يبتغ غــــير الإســــلام ديــــناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾ (آل عمران:٨٥) وهي ملة إبراهيم عليه السلام التي من رغب عنها فهو من السفهاء .

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ) বলেন, ইচ্ছা এবং নিয়্যাতের দ্বারা যে শিরক হয় উহা এমনি এক সাগর যার কুল কিনারা নেই, আর খুব কম সংখ্যক লোক এ থেকে বেচে থাকতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি তার আমল দ্বারা আল্লাহকে সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কিছু পেতে চায়, এবং আল্লাহর নৈকট্য ব্যতীত অন্য কোন কিছুর নিয়্যত করে আর তা থেকে বিনিময় চায়, তবে সে তার নিয়্যাত ও ইরাদায় শিরক করল। পক্ষান্তরে ইখলাস (একনিষ্ঠতা) হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য থাকবে তার কাজে, কথায়, ইচ্ছা এবং নিয়্যাতে। আর ইহাই হলো ইব্রাহীম عليه السلام অবলম্বিত একাগ্রতাপূর্ন ধর্ম যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর সকল বান্দাদেরকে পালন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আর উহা ব্যতীত কারো আমল কবূল করবেন না। আর উহাই প্রকৃত ইসলাম। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

﴿ وَمَــن يَبْــتَغِ غَــيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (آل عمران: ٨٥)

অর্থাৎ যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে

(খ) কুফরের প্রকার ঃ ইহা দুই প্রকারঃ

প্রথম প্রকারঃ বড় কুফর যা মানুষকে ইসলামী মিল্লাত হতে বের করে দেয়। উহা আবার পাচ ভাগঃ

এক: মিথ্যা প্রতিপন্নের মাধ্যমে কুফরী করা।

তার প্রমাণ আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ (العنكبوت:٦٨)

অর্থাৎ যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তাকে অস্বীকার করে, তার কি স্মরণ রাখা উচিত নয় যে, জাহান্নামই সেসব কাফেরের ঠিকানা হবে? (সূরা আনকাবুতঃ৬৮)

দুই: সত্যকে জানা সত্ত্বেও অহংকার ও অস্বীকারের মাধ্যমে কুফরী করা। ইহার প্রমাণ হল আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (البقرة:٣٤)

অর্থাৎ এবং যখন আমি আদম (عليه السلام) কে সিজদা করার জন্য ফেরেস্তাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখনই ইবলিশ ব্যতীত সবাই সিজদা করল। সে (নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে

কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (সূরা বাকারাঃ৩৪)

তিনঃ সন্দেহের মাধ্যমে কুফরী করা। আর ইহা হল ধারনার কুফরী। ইহার প্রমাণ আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণী:

﴿ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَّكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴾(الكهف: ٣٥-٣٨)

অর্থাৎ, নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল আমার মনে হয় না যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হবে এবং আমি মনে করি না যে, কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। যদি কখনও আমার পালনকর্তার কাছে আমাকে পৌছে দেয়া হয় তবে সেখানে এর চেয়ে উত্তম পাব, তার সঙ্গী তাকে কথা প্রসঙ্গে বলল: তুমি তাকে অস্বীকার করছ? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে অতঃপর বীর্য থেকে অতঃপর পুর্ণাঙ্গ করেছেন তোমাকে মানবাকৃতিতে কিন্তু আমি তো একথাই বলি আল্লাহই আমার পালনকর্তা এবং আমি কাউকে আমার পালনকর্তার শরীক করি না।(সূরা কাহাফঃ৩৫-৩৮)

চারঃ মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কুফরী। এর প্রমাণ হল আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ﴾ (الأحقاف :٣)

অর্থাৎ আর কাফেররা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা আহক্বাফঃ৩)

পাচ: কুফরে নেফাক বা মুনাফেকীর মাধ্যমে কুফরী করা। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾

(المنافقون: ٣)

অর্থাৎ এটা এজন্য যে তারা বিশ্বাস করার পর পুনরায় কাফের হয়ে গেছে ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। অতঃপর তারা বুঝে না। (সূরা মুনাফেকুনঃ৩)

দ্বিতীয় প্রকার: কুফরে আসগার বা ছোট কুফরী। যা মানুষকে ইসলামী মিল্লাত হতে বহিষ্কার করে না। এই কুফরী কাজের দ্বারা সংঘটিত হয় । এই কুফরী ঐ সমস্ত পাপকে বলা হয় যার নাম কোরাআন ও সুন্নায় কুফরী নামে উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু উহা বড় কুফরীর সীমা পর্যন্ত পৌছে না। যেমন, নেয়ামত সমূহের কুফরী করা , যা আল্লাহ তায়ালার বাণীতে উলেখিত রয়েছে:

﴿وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ ﴾ (النحل: ١١٢)

অর্থাৎ আল্লাহ পাক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন একটি জনপদের

যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিত, তথায় প্রত্যেক জায়গা থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ। অতপর তারা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। (সূরা নাহাল:১১২)

আর যেমন মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা, রাসূলের বাণীতে বর্ণিত আছে:

(سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ)

অর্থাৎ কোন মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী কাজ আর তার সাথে লড়াই করা কুফরী। (বুখারী, মুসলিম) মহা নাবী ﷺ আরো বলেনঃ

(لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)

অর্থাৎ তোমরা আমার মৃত্যুর পর এমন কুফরীতে ফিরে যেওনা, যার দরুন তোমরা পরস্পরের গর্দান উড়িয়ে দিবে। (বুখারী ও মুসলিম)

আর যেমন আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা। মহা নাবী ﷺ বলেনঃ

(مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করে, সে কুফরী করল অথবা শিরক করল।(তিরমিজী - হাকেম একে সহীহ বলেছেন)

এ বিষয়ে মহাপাপে লিপ্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ মুমিন বলে আখ্যায়িত করেছেন আল্লাহ বলেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (البقرة: ١٧٨)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। (সূরা বাকারাঃ১৭৮)

সুতরাং তিনি (আল্লাহ) হত্যাকারীকে ঈমানদারদের মধ্য থেকে বের করে দেননি এবং তাকে কেসাস গ্রহণকারী অভিভাবকের ভাই হিসেবে গণ্য করেছেন। অতঃপর বলেছেনঃ

﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ﴾ (البقرة: ١٧٨)

অতঃপর তার ভায়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালভাবে তা প্রদান করতে হবে। (সূরা বাকারাঃ১৭৮)

এখানে ভাই বলতে নিঃসন্দেহে দ্বীনী ভাই বুঝানো হয়েছে। এবং আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেনঃ

﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ (الحجرات : ٩)

অর্থাৎ যদি মুমিনদের দুদল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। (সূরা হুজুরাতঃ ৯)

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ (الحجرات: ١٠)

অর্থাৎ: মুমিনেরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের দু ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে। (সূরা হুজুরাত ঃ১০) সংক্ষিপ্ত আকারে তাহাবিয়ার ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

বড় কুফরী ও ছোট কুফরীর মধ্যে পার্থক্যের সার সংক্ষেপঃ

১। বড় কুফরী মানুষকে ইসলামী মিল্লাত থেকে বের করে দেয় এবং সমস্ত নেক আমলকে নষ্ট করে দেয়, পক্ষান্তরে ছোট কুফরী ইসলামী মিল্লাত থেকে বের করে না এবং আমল নষ্ট করে না। তবে তার আমলের নেকীর মধ্যে পরিমান মত ঘাটতি আনে, ফলে ছোট কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তি শাস্তির সম্মুখীন হয়ে পড়ে।

২। বড় কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয় । আর ছোট কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তি জাহান্নামে গেলেও সেখানে চিরস্থায়ীভাবে থাকবে না কখনও কখনও ছোট কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তির পাপরাশী আল্লাহ নিজে থেকে ক্ষমা করে দেন। ফলে সে আদৌ জাহান্নামে প্রবেশ করে না।

৩। বড় কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তির রক্ত ও সম্পদ মুসলমানদের জন্য হালাল হয়ে যায় কিন্তু ছোট কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তির রক্ত ও সম্পদ কখনই মুসলমানদের জন্য হালাল হয় না।

৪। বড় কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তির মাঝে ও মুমিনদের মাঝে শত্রুতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। মুমিনদের জন্য তার ভালবাসা

ও মেলামেশা বা বন্ধুত্ব করা বৈধ নয়। যদিও সে নিকটতম আত্মীয় হয়, কিন্তু ছোট কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তির সাথে মেলামেশা সাধারণ ভাবে বাধা নেই। বরং তার মাঝে ঈমানের পরিমাণ অনুসারে তার সাথে মিলামিশা করা যাবে এবং ভালবাসা করা যাবে। আর তার নাফরমানী বা অবাধ্যতার পরিমাণ অনুসারে তার সাথে শত্রুতা পোষণ করা যাবে এবং রাগ করা যাবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিফাক্ব, তার পরিচয় ও প্রকারভেদঃ

(ক) নিফাক্ব এর পরিচয়ঃ

نفاق শব্দটি ভাষাগত نَافَقَ এর শব্দমুল। এরূপ বলা হয়: نَافَقَ يُنَافِقُ نِفَاقًا وَ مُنَافَقَةً আর ইহা نَافِقَاءِ হতে গৃহীত। এবং নাফেকায়া বলতে, জংলী ইঁদুর তার গর্ত হতে বের হওয়ার সুড়ঙ্গ পথগুলির কোন একটিকে বুঝায়। আর ইঁদুরকে মুনাফিক এই জন্য বলা হয় যে, তাকে যখন ধরার জন্য তার বহিরাগমন একটি পথে সন্ধান করা হয়, তখন সে ভিন্ন পথে পালিয়ে গিয়ে সেখান দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। মতান্তরে: নিফাক শব্দটি نَفَقٌ হতে গৃহীত। আর এটি এমন সুড়ঙ্গ, যেখানে ইঁদুর আত্মগোপন করে থাকে। (ইবনে আসীর রচিত "আন-নিহায়া" ৫/৯৭)

আর শরীয়তের পরিভাষায় نفاق শব্দের অর্থ মুখে ইসলাম প্রকাশ করা এবং অন্তরে কুফর ও ক্ষতিকর বিষয় গোপন রাখা। উহাকে এই নামে এইজন্য নামকরণ করা হয়েছে যে, সে ইসলামের মধ্যে এক পথ দিয়ে প্রবেশ করে এবং সে উহা হতে অন্য পথ দিয়ে বের হয়ে যায়। ঐ মর্মে মাহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর ভাষায় সতর্ক করে বলেছেনঃ

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (التوبة: ٦٧)

অর্থাৎ নিশ্চয় মুনাফিকরাই ফাসিক। (সূরা তাওবাঃ ৬৭) তার অর্থ হল তারা শরিয়ত থেকে বের হয়ে যায়। আর আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদেরকে কাফিরদের চেয়ে অধিকতর নিকৃষ্ট বলেছেন সেহেতু আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেনঃ

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ (النساء: ١٤٥)

অর্থাৎ নিশ্চয় মুনাফিকরা রয়েছে দোযখের সর্ব নিম্নস্তরে। (সূরা নিসাঃ১৪৫)

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾ (النساء :١٤٢)

অবশ্যই মুনাফিকরা প্রতারনা করছে আল্লাহর সাথে আর আল্লাহ তাদের বদলা দানকারী, (সূরা নিসাঃ ১৪২)

﴿يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ (البقرة: ٩-١٠)

অর্থাৎ তারা আল্লাহ এবং ঈমানদারগণকে ধোকা দেয়। এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোকা দেয় না। অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না। তাদের অন্তর ব্যধিগ্রস্ত আর আল্লাহ তাদের ব্যধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন বস্তুত তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব তাদের মিথ্যাচারের দরুন। (সূরা বাকারাঃ ৯-১০)

(খ) নিফাকের প্রকারভেদঃ

নিফাক দুই প্রকারঃ

এক: নিফাকে এ'তেকাদী বা বিশ্বাসগত নিফাক। এটা হচ্ছে বড় নিফাক। মুনাফিক ব্যক্তি মুখে ইসলাম প্রকাশ করে, আর অন্তরে কুফরী গোপন রাখে। এ প্রকারের নিফাক মুনাফিককে ইসলাম থেকে সম্পুর্ণরূপে বহিষ্কার করে দেয়। এ নিফাক যার মাঝে থাকবে সে জাহান্নামের অতল তলে তলিয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা এ ধরনের মুনাফিক ব্যক্তিকে সর্ব প্রকার অকল্যাণকারী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যেমন কুফরী

করা, ঈমান আনয়ন না করা, ধর্ম এবং ধর্মীয় লোকদেরকে উপহাস করা ও তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা করা এবং ইসলামের শত্রুদের সাথে একাত্বতা করে ইসলামের শত্রুতার জন্য পূর্ণরূপে ঝুকে পড়া। আর এ ধরণের লোকদেরকে সর্বযুগেই পাওয়া যায়। বিশেষ করে ইসলাম যখন শক্তিশালী হয়ে উঠে তখন তারা প্রকাশ্যভাবে প্রতিহত করতে পারে না, তাই তারা ইসলামে বাহ্যিকভাবে প্রবেশ করে, গোপনে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে। আর যাতে করে তারা মুসলামনদের সাথে থেকে জীবন যাপন করতে পারে এবং তাদের জান ও মাল নিরাপদে রাখতে পারে। সুতরাং মুনাফিক ব্যক্তি আল্লাহ, ফিরিস্তা, কিতাবসমূহ ও রাসূলগণ এবং শেষ বিচারের দিনের প্রতি প্রকাশ্যভাবে ঈমান আনে অথচ সে গোপনে ঐ সকল জিনিসের প্রতি ঈমান আনা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখে, এবং এগুলোকে করে মিথ্যা প্রতিপন্ন। আল্লাহতে বিশ্বাস করে না, আর এ কথাও বিশ্বাস করে না যে, আল্লাহ এমন কিছু কথা বলেছেন যা কোন ব্যক্তির উপর নাযিল করেছেন, যাকে তিনি মানুষের জন্য রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। সে রাসূল আল্লাহর নির্দেশে তাদেরকে পথ দেখাবেন, এবং আল্লাহ তায়ালা কোরআন

কারীমে এ সকল মুনাফিকদের পর্দা উম্মোচন করেছেন এবং তাদের গোপন ষড়যন্ত্র ফাশ করে দিয়েছেন। আর তিনি তাঁর বান্দাদের তাদের (মুনাফিকদের) বিষয়সমূহ স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। যাতে করে নেফাকী ষড়যন্ত্র এবং মুনাফিকদের থেকে সতর্ক থাকতে পারে। আর তিনি (আল্লাহ) সূরা বাকারার প্রথমাংশে তিন শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন তারা হলেন, ঈমানদারগণ, কাফিরগণ ও মুনাফিকগণ। অতএব মুনিনদের মর্মে ৪টি আয়াত, আর কাফিরদের মর্মে দুটি আয়াত, আর মুনাফিকদের মর্মে তেরটি আয়াত নাযিল করেছেন তাদের সংখ্যায় বেশী হওয়া আর তাদের দ্বারা সাধারণ বিপদ আসা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তাদের কঠিন ফিতনা হওয়ার কারণে। ফলে তাদের দ্বারা ইসলামের বিপর্যয় অতীব কঠিন হয়। কেননা তাদের মেলামেশা তাদের সহযোগীতা ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু তারা প্রকৃত পক্ষে ইসলামের শত্রু। তারা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তার সাথে শত্রুতা প্রকাশ করে। মূর্খলোক ধারনা করে যে ইহাই জ্ঞানপূর্ণ এবং সংস্কার মূলক। পক্ষান্তরে ইহা চরম মূর্খতা ও বিপর্যয় ছাড়া কিছু নয়। (ইবনুল কাইয়্যিম রচিত -মুনাফিকদের বর্ণনা গ্রন্থ থেকে)

আর এই নিফাক ছয় প্রকার: (মাজমূয়াতু ত্বাউহীদ পৃষ্ঠা ৯)

১। রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

২। রাসূলের আনিত বিধানসমূহের কতককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

৩। রাসূলের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।

৪। রাসূলের আনিত বিধানের কতকের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।

৫। রাসূলের দ্বীন অবনমিত হওয়ায় খুশী প্রকাশ করা।

৬। রাসূলের দ্বীনের বিজয়কে খারাপ মনে করা।

দুইঃ নিফাকে আমলী বা কর্মের নিফাকঃ

অন্তরে ঈমান রেখে মুনাফিকদের কোন আমল করা, ইহাকে আমলী নিফাক বলা হয়। আর এ নিফাক ইসলামী মিল্লাত হতে বের করে না। কিন্তু ইহা মুনাফিক হওয়ার মাধ্যম। এ ধরণের মুনাফিকের মাঝে ঈমান ও নিফাক দুটাই থাকে। আর যখন নিফাক বেশী হয়, তখন এ কারণে সে পূর্ণ মুনাফিক হয়ে যায়। এর প্রমাণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণীঃ

(أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أوتمن خان وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر)

অর্থাৎ যাদের মধ্যে এই চারটি দোষ আছে তারা পূর্ণ মুনাফিক

এবং যার মধ্যে এর কোন একটিও আছে, তার মধ্যে এই মুনাফিকী থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ত্যাগ করে। যখন তার নিকট আমনত রাখা হয়, তখন সে তা নষ্ট করে। আর যখন যা বলে মিথ্যা বলে, আর যদি প্রতিজ্ঞা করে, ভঙ্গ করে, আর যখন ঝগড়া করে, তখন অকথ্য ভাষা বলে। (বুখারী, মুসলিম)

সুতরাং যার মধ্যে এই চারটি দোষ একত্রিত হবে তার মধ্যে সব ধরণের অন্যায় একত্রিত হবে এবং তার মধ্যে মুনাফিকীনদের গুনাবলী খালিস হবে। আর যার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে, সে একটি বৈশিষ্ট্যে মুনাফিক হবে। সুতরাং কখনো কখনো একজন বান্দার মাঝে ভাল ও মন্দ বৈশিষ্ট্য,ঈমানী বৈশিষ্ট্য, কুফরী ও নিফাকী বৈশিষ্ট্য একত্রিত হয়। আর সে পূণ্য ও পাপের অধীকারী হয় তার কর্ম মুতাবিক। এর মধ্যে একটি হল মসজিদে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করার ব্যাপারে অলসতা করা। কেননা ইহা মুনাফিকী বৈশিষ্ট্যের একটি। সুতরাং নিফাক হচ্ছে অতীব মন্দ ও ভয়ানক ক্ষতিকর। আর সাহাবাগণ এতে নিপতিত হওয়া থেকে ভয় করতেন।

ইবনু আবী মুলাইকা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ৩০ জন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছি তারা সকলেই নিজের নফসের উপর নিফাককে ভয় করতেন।

নিফাকে আকবার ও নিফাকে আসগার এর মধ্যে পার্থক্য সমূহ।

১। নিফাকে আকবার ইসলামী মিল্লাত থেকে বের করে দেয়। পক্ষান্তরে নিফাকে আসগার ইসলামী মিল্লাত থেকে বের করে না।

২। নিফাকে আকবার এতেক্বাদে গোপনে ও প্রকাশ্যে ইখতেলাফ আর নিফাকে আসগার প্রকাশ্যে ও গোপনে এতেক্বাদ ব্যতীত আমলে ইখতেলাফ।

৩। নিফাকে আকবার মুমিন থেকে সংঘটিত হয় না। কিন্তু নিফাকে আসগার কখনও কখনও মুমিন থেকে সংঘটিত হয়ে থাকে।

৪। নিফাকে আকবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুনাফিক ব্যক্তি তাওবা করে না, আর যদিও তাওবা করে তবুও তার তাওবা গ্রহণের ব্যাপারে হাকীমের নিকট মতভেদ রয়েছে। কিন্তু নিফাকে আসগার তার বিপরীত কেননা ছোট নিফাককারী ব্যাক্তি কখনও কখনও আল্লাহর নিকট তাওবা করে, অতপর আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (و كثيراً ما تعرض للمؤمن من شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس

الكفر التي يضيق بها صدره كما قال الصحابة يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما لئن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به فقال) (ذلك صريح الإيمان) وفي رواية (مايتعاظم أن يتكلم به قال : الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة) أي حصول هذه الوساوس مع هذه الكراهة العظيمة ودفعه عن القلب هو من صريح الإيمان ، انتهى.

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহ) বলেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিফাকের শাখাসমূহের কোন একটি শাখা মুমিনের মুখামুখী হয়, অতঃপর আল্লাহ তার পাপ ক্ষমা করেন। কখনও কখনও তার অন্তরে এমন কথা উদয় হয় , যা নিফাককে ওয়াজীব করে দেয়। কিন্তু আল্লাহ উহা তার উপর হতে প্রতিহত করেন। আর মুমিন ব্যক্তি শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং কুফরী কুমন্ত্রণা দ্বারা পরীক্ষীত হয়, যা অন্তরকে সংকীর্ণ করে দেয়।

যেমন সাহাবা ﷺ বলতেন হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয় আমাদের মধ্যে কারো কারো অন্তরে এমন জিনিসের উদয় হয়, যা প্রকাশ হওয়ার চেয়ে আকাশ থেকে পৃথিবীতে ছিটকে পড়াও তার কাছে উত্তম। অতঃপর উত্তরে তিনি ﷺ বললেনঃ ذلك صريح الإيمان উহা হল স্পষ্ট ঈমান। (আহমদ, মুসলিম)

আর অন্য বর্ণনায় আছে যা বলতে ভারী লাগে প্রতি উত্তরে তিনি ﷺ বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তার চক্রান্তকে প্রতিহত করে কুমন্ত্রনায় পরিণত করেছেন অর্থাৎ এত বিরাট ধরণের অপছন্দতা থাকা সত্বেও এ কুমন্ত্রনা অর্জন হওয়া এবং ইহা অন্তর থেকে প্রতিহত করাই হল প্রকৃত ঈমানের পরিচয়। সমাপ্ত।

আর পক্ষান্তরে বড় মুনাফিক তাদের মর্মে আল্লাহ উল্লেখ করেছেনঃ

﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ﴾ (البقرة: ١٨)

অর্থাৎ তারা বধির, মুক ও অন্ধ। তারা ফিরে আসবেনা। (সূরা বাকারাঃ১৮)

তার অর্থ এই বুঝায় যে তারা আন্তরিক ভাবে ইসলামের দিকে ফিরে আসবে না এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে আরো বলেছেনঃ

﴿أَوَلاَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾(التوبة : ١٢٦)

অর্থাৎ তারা কি লক্ষ্য করে না প্রতিবছর দু, একবার বিপর্যস্ত হচ্ছে অথচ তারা এরপরেও তওবা করে না, কিংবা উপদেশ গ্রহণ করে না। (সূরা তাওবাঃ ১২৬)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وقد اختلف العلماء في قبول توبتهم في

الظاهر ، لكون ذلك لا يعلم ، إذ هم دائماً يظهرون الإسلام .

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেছেন, আলেমগণ, প্রকাশ্যে তাদের (মুনাফিকদের) তাওবা গ্রহণ করার ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন। উহা এই জন্য যে (তারা তাওবা করল কিনা) জানা যায় না। কারণ তারা সর্বদা মুখে ইসলাম প্রকাশ করে থাকে। (মাজমূউল ফাতাওয়া – ২৮/৪৩৪-৪৩৫)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নিম্নের প্রতিটি বিষয়ের প্রকৃতির বিবরণঃ

জাহিলীয়্যাহ, ফিসক, জালাল, রিদ্দাহ এগুলির বিভাগসমূহ ও বিধি বিধান।

একঃ জাহেলিয়্যাহঃ জাহেলিয়্যাহ বা মুর্খতা এমন অবস্থাকে বুঝায়, যা ইসলাম পূর্বযুগে আরবদের মাঝে বিরাজমান ছিল। যেমন আল্লাহ বিষয়ে ও তার রাসূলগণের বিষয়ে এবং শরীয়তের বিধিবিধানে অজ্ঞতা। আর বংশ নিয়ে গৌরব , অহংকার ইত্যাদি। (ইবনে আসীর রচিত 'আন নিহায়া' – ১/৩৩২) ইহা মুর্খতার দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। যা জ্ঞান না থাকা অথবা ইসলামী জ্ঞানের অনুসরণ না করা।

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلاً

بسيطاً. فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلاً مركباً. فإن تبين ذلك فالناس قبل بعث الرسول ﷺ كانوا في جاهلية منسوبة إلى الجهل. فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل . وإنما يفعله جاهل. وكذلك كل ما يخالف ما جاء به المرسلون منه يهودية ونصرانية فهو جاهلية. وتلك كانت الجاهلية العامة . فأما بعد مبعث الرسول ﷺ قد تكون في مصر دون مصر كما هي قبل أن يسلم فإنه في جاهلية وإن كان في دار الإسلام . فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد ﷺ فإنه لاتزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. والجاهلية المقيدة قد توجد في بعض ديار المسلمين في كثير من الأشخاص المسلمين. كما قال ﷺ أربع في أمتي من أمر الجاهلية وقال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية ونحو ذلك. انتهى

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন, নিশ্চয় যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্যকে জানেনা সে এক ধরনের মূর্খ। যদি সে প্রকৃত সত্য দ্বীনের বিপরীত বিষয়ে বিশ্বাস রাখে তাহলে সে ডবল মূর্খ। এই বর্ণনায় স্পষ্ট হল যে রাসূল প্রেরণের পূর্বে যেসব মানুষেরা অজ্ঞতায় ছিল, অজ্ঞতার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে তাদেরকে জাহিলিয়্যাতের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। কেননা তারা যে সব কথা এবং কাজের উপর ছিল, তা

একমাত্র তাদের জন্য উদভাবন করেছিল জাহেল বা মূর্খ লোক এবং উহা পালনও করেছিল জাহিল ব্যক্তি। আর অনুরূপভাবে ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের মধ্য থেকে, প্রেরিত রাসূলগণের আনীত বিষয়ের যা কিছু বিপরীত করা হয়েছে তাও জাহিলিয়্যাহ মূর্খতা। আর এটাও ছিল পূর্ণ অজ্ঞতা। অতঃপর রাসূল ﷺ এর আবির্ভাবের পর কখনও বর্বরতা চলে কোন কোন শহরে যেমন দারুল কুফ্ফারে । আবার কোন বর্বরতা বিরাজ করে কোন কোন ব্যক্তির মাঝে। যেমন এক ব্যক্তি সে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে অজ্ঞতার জীবন যাপন করে যদিও সে দারুল ইসলামে বসবাস করুক না কেন। অতঃপর মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রেরণের পর সাধারণ ভাবে কোন যুগকে জাহিলিয়্যাহ বলা যায় না। কারণ তার উম্মতের মধ্য হতে একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর (জাহিলিয়্যাহ বা মূর্খতা) জাহিলিয়্যাতে মুকাইয়াদ বা সীমিত অজ্ঞতা কখনও মুসলমানদের কিছু কিছু এলাকায় অনেক মুসলমান ব্যক্তি বর্গের মাঝে পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহর নাবী ﷺ ফরমানঃ

(أربع في أمتي من أمر الجاهلية)

অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে অজ্ঞতার চারটি বিষয় রয়েছে। (মুসলিম)

তিনি ﷺ আবু জারকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন: (বুখারী, মুসলিম)

(إنك امرؤ فيك جاهلية)

অর্থাৎ তুমি এমন ব্যক্তি তোমার মাঝে অজ্ঞতা রয়েছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর পূর্ব আলোচনার সারাংশঃ মুর্খতার দিকে সম্বন্ধ করে জাহিলিয়্যাহ বলা হয়। আর তা অজ্ঞতা, আর তার ২টি ভাগ নিম্নরূপঃ

১। জাহিলিয়্যাহ আম্মাহ বা সাধারণ মুর্খতা, যা রাসূল ﷺ এর আবির্ভাবের পূর্বে ছিল। তা উনার আবির্ভাবের পরে শেষ হয়ে গেছে।

২। জাহিলিয়্যাহ খাস্সাহ বা বিশেষ মূর্খতা যা কোন কোন দেশে ও কোন কোন শহরে এবং কোন ব্যক্তি বিশেষের মাঝে সর্বদা বিরাজমান। আর এ বর্ণনা দ্বারা ভুল প্রমাণিত হচ্ছে ঐ সমস্ত ব্যক্তির কথা, যারা বর্তমান যামানায় জাহিলিয়্যাতকে আম ভাবে আখ্যায়িত করেছে। তারা বলে যে, বর্তমান যুগের জাহিলিয়্যাত ঐরূপ। তবে এইভাবে বলা ঠিক হবেঃ এই যুগের কিছু বর্বরতা অথবা এই যুগের বেশীর ভাগ বর্বরতা বা অজ্ঞতা। কিন্তু সাধারণ ভাবে বলা সঠিক নয়। কেননা নাবী কারীম ﷺ এর আবির্ভাবের পর সাধারণ জাহিলিয়্যাত দুরিভূত হয়েছে।

দুইঃ ফিসকঃ ইহা ভাষাগত ভাবে বলা হয়, বের হয়ে যাওয়া। আর শরীয়তের পরিভাষায় বলা হয়, আল্লাহর আনুগত্য হতে বের হয়ে যাওয়া। আর উহা কখনও

সম্পূর্ণভাবে বের হয়ে যাওয়াকে বুঝায়, ফলে কাফিরকে ফাসিক বলা যায়। আর আংশিক ভাবে বের হওয়াকেও বুঝায়, ফলে বড় পাপ সংঘটিতকারী মুমিনকে ফাসিক বলা হয়।

অতএব, ফিসক দুই প্রকারঃ এক প্রকার ফিসক ইসলামী মিল্লাত থেকে বের করে দেয়, যাকে কুফর বলা হয়েছে। তাই কাফিরকে ফাসিক বলা যায়। আল্লাহ তায়ালা ইবলিসের কথা উল্লেখ করে বলেছেনঃ

﴿ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾ (الكهف: ٥٠)

অর্থাৎ সে তার প্রভূর আদেশ লজ্ঘন করল। (সূরা কাহাফ: ৫০) আর তার এই আদেশ লজ্ঘন ছিল কুফরী। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেনঃ

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ﴾ (السجدة : ٢٠)

অর্থাৎ পক্ষান্তরে যারা অবাধ্য হয়, তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম। (সূরা সাজদাহঃ ২০)

এখানে (ফাসাকু) দ্বারা কাফিরদের বুঝানো হয়েছে। উহার প্রমাণে তাঁর নিম্নোক্ত বাণীঃ

﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾ (السجدة: ٢٠)

অর্থাৎ যখন তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাবে, তখন তাদের তথায় ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা

হবে তোমরা জাহান্নামের যে আযাব মিথ্যা বলতে, তার সাধ আস্বাদন কর। (সূরা সাজদাহঃ ২০)

আর মুসলমানদের মধ্যেকার যে ব্যক্তি গুনাহগার তাকে ফাসিক বলা হয়েছে। আর তার ফিসক তাকে ইসলাম থেকে বের করে নাই। আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾(النور:٤)

অর্থাৎ যারা সতী-সাধবী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে, এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। এরাই নাফরমান। (সূরা নূরঃ ৪)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেনঃ

﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ (البقرة:١٩٧)

অর্থাৎ এসব মাসে যে লোক হজ্জের নিয়্যত করবে, তার পক্ষে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা অশোভন কোন কাজ করা ও ঝগড়া করা জায়েয নয়। (সূরা বাকারাঃ ১৯৭) এখানে আলিমগণ ফুসুক শব্দের ব্যাখ্যাতে বলেছেনঃ গুনাহের কাজ সমূহ। (কিতাবুল ঈমান ইবনে তাইমিয়্যা – ২৭৮পৃঃ)

তিন ঃ যালালঃ যালাল হল সরল পথ থেকে ফিরে যাওয়া,

আর এটা হল হেদায়াতের বিপরীত। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ (الإسراء:١٥)

অর্থাৎ যে কেউ সৎ পথে চলে সে নিজের মঙ্গলের জন্যই সৎ পথে চলে, আর যে পথভ্রষ্ট হয়, সে নিজের অমঙ্গলের জন্য পথভ্রষ্ট হয়। (সূরা ইসরাঃ১৫)

আর যালাল কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ঃ

১। কখনও কুফর অর্থে আসে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا ﴾ (النساء:١٣٦)

অর্থাৎ যে আল্লাহর উপর তাঁর ফিরিস্তাদের উপর তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং রাসূলগণের উপর ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস করবে না। সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে সরে পড়বে। (সূরা নিসাঃ ১৩৬)

২। কখনও শিরক অর্থে আসে, আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّه فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا ﴾ (النساء: ١١٦

অর্থাৎ যে আল্লাহর সাথে শিরক করবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহুদূরে সরে পড়বে। (সূরা নিসাঃ১১৬)

৩। কখনও বিরোধীতার অর্থে আসে, যা কুফরী হয় না। যেমন বলা হয় পথভ্রষ্ট দলসমূহ অর্থাৎ বিরোধী।

৪। কখনও ভুল অর্থে আসে আর এ মর্মে মুসা ﷺ এর বাণীঃ

﴿ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴾ (الشعرا: ٢٠)

অর্থাৎ তিনি মুসা عليه السلام বললেন, এ অপরাধ আমি তখন করেছি, যখন আমি ভ্রান্তিতে ছিলাম। শুআরাঃ২০)

৫। কখনও ভুলে যাওয়া অর্থে আসে, আর এ অর্থ সমর্থনে আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ

﴿ أن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ﴾ (البقرة: ٢٨٢)

অর্থাৎ দুজনের মধ্যে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। (সূরা বাকারাঃ ২৮২)

৬। কখনও হারানো এবং গাইব হয়ে যাওয়ার অর্থে আসে। আর এই অর্থে বলা হয়ঃ

ضالة الإبل উট হারানো। (ইমাম রগিব এর মুফরাদাত – পৃঃ ২৯৭- ২৯৮)

চারঃ রিদ্দাহ তার শ্রেণী বিভাগ ও বিধি বিধান।

রিদ্দাহ ভাষাগত অর্থে প্রত্যাবর্তণ করা। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿ وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ ﴾ (المائدة: ٢١)

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে প্রত্যাবর্তন করো না। (সূরা মায়িদাহঃ২১)

তার অর্থ হল তোমরা ফিরে যেও না। এবং রিদ্দাহ ফিকহ

এর পরিভাষায়ঃ ইসলামের পরে কুফরী করাকে বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

(البقرة: ٢١٧)

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল নষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হল দোযখ বাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে। (সূরা বাকারাঃ২১৭)

রিদ্দাহর প্রকার সমূহঃ রিদ্দাহ হয় ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহের একটি বিষয় সংঘটিত হওয়ার দ্বারা। আর ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ অনেক। তবে এইগুলিকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ

১। রিদ্দাহ কথায়ঃ যেমন আল্লাহকে গালী দেয়া অথবা তাঁর রাসূলকে গালী দেয়া অথবা তাঁর ফিরিস্তাগণকে গালী দেয়া অথবা তার কোন একজন রাসূলকে গালী দেয়া অথবা ইলমে গায়েব দাবী করা অথবা নবুওয়াত দাবী করা, অথবা নবুওয়াতের দাবীদারকে বিশ্বাস করা অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট দোয়া করা অথবা অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা

করা যার উপর আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ ক্ষমতা রাখে না অথবা অন্যের কাছে ঐ সব ব্যাপারে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

২। রিদ্দাহ কর্মেঃ যেমন মূর্তি, বৃক্ষ, পাথর এবং কবরসমূহ সিজদা করা এবং ইহার উদ্দেশ্যে যবেহ করা।

আর অপবিত্র স্থানগুলিতে কোরআন শরীফ ফেলে দেয়া আর যাদুর কাজ করা এবং যাদু শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া। আর আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দ্বারা ফয়সালা করা বৈধ মনে করে ফয়সালা করা।

৩। রিদ্দাহ বিশ্বাসেঃ যেমন আল্লাহর অংশীদার আছে বলে বিশ্বাস করা অথবা জ্বিনা, মদ ও সুদকে হালাল বলে বিশ্বাস করা। অথবা রুটিকে হারাম বলা অথবা নামায ওয়াজিব নয় বলে বিশ্বাস করা ইত্যাদি। যেগুলো হালাল অথবা হারাম অথবা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য ইজমা রয়েছে,তার মত ব্যক্তির নিকট অজানা থাকার নয়।

৪। রিদ্দাহ ইতিপূর্বে বর্ণিত বিষয়ে সন্দেহ পোষণেঃ

যেমন শিরক হারাম হওয়ার ব্যাপারে কেউ সন্দেহ করলে অথবা জ্বিনা ও সুরা পান হারাম হওয়ার ব্যাপারে কিংবা রুটি হালাল হওয়ার ব্যাপারে। অথবা নাবী কারীম ﷺ এর রিসালাত সম্পর্কে সন্দেহ করা অথবা অন্য কোন নাবীর রিসালাত সম্পর্কে অথবা তার সত্যতার ব্যাপারে , অথবা দ্বীন

ইসলাম সম্পর্কে অথবা বর্তমান যুগে ইহা প্রযোজ্য হওয়ার ব্যাপারে।

রিদ্দাহর বিধানসমূহ যা, তা প্রমাণিত হওয়ার পর তার উপর জারি করা হবেঃ

১। মুরতাদকে তাওবা করতে বলা, অতঃপর যদি সে তাওবা করে এবং তিন দিনের ব্যবধানে ইসলামের দিকে ফিরে আসে, তবে তার তাওবা গ্রহণ করতে হবে এবং তাকে ছেড়ে দিতে হবে।

২। যখন সে তাওবা করতে অস্বীকার করবে, তখন তাকে কতল করা ওয়াজিব হবে। প্রমাণে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণীঃ

(من بدل دينه فاقتلوه)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার ধর্মকে পরিবর্তন করবে তাকে তোমরা কতল কর। (বুখারী ও আবু দাউদ)

৩। তাকে (মুরতাদকে) তার সম্পদ ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখবে যখন তার কাছে তাওবা চাওয়া হবে এর মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত। অতঃপর সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে তা তার জন্য থাকবে, অন্যথায় বায়তুল মালের সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে, তাকে কতল করার সময় থেকে অথবা রিদ্দাহর উপর মৃত্যু হওয়ার সময় থেকে।

আর কেউ বলেছেন যে, তার মুরতাদ হওয়ার কাল থেকে তার সম্পদ মুসলমানদের কল্যাণ খাতে ব্যয় করা হবে।

৪। তার মাঝে এবং তার আত্মীয়দের মাঝে উত্তরাধীকার সূত্র ছিন্ন হবে। অতএব সে তাদের ওয়ারিস হবে না এবং তারাও তার ওয়ারিস হবে না।

৫। যখন সে মৃত্যু বরন করবে অথবা তার রিদ্দাহর উপর কতল করা হবে তখন তাকে গোসল দেয়া হবে না। তার উপর জানাজা পড়তে হবে না এবং মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করতে হবে না। একমাত্র তাকে কাফিরদের কবরস্থানে দাফন করতে হবে অথবা মুসলমানদের কবরস্থান ব্যতীত অন্য যে কোন স্থানে মাটি দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যে সব কথা ও কাজ তাওহীদকে বিনষ্ট করে অথবা ক্রুটিযুক্ত করে সে সব মর্মে নিম্নের পরিচ্ছেদ সমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

হাত এবং পিয়ালায় কিছু পড়ে ইলমে গায়েব দাবী করা।

গায়েব বলতে যা বুঝায়ঃ যা ভবিষ্যত বিষয়ে ও অতীত বিষয়ে হয়ে থাকে। আর যা দেখা যায় না এমন অজানা জিনিষকে গায়েব বলা হয়। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ইলমে গায়েবকে নিজের হাতে রেখেছেন এবং মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ (النمل: ٦٥)

হে মুহাম্মাদ (ﷺ) আপনি বলুন, আসমান ও যমিনের অদৃশ্যের সংবাদ একমাত্র আল্লাহই জানেন। (সূরা নমলঃ ৬৫) সুতরাং অদৃশ্যের জ্ঞান পবিত্র আল্লাহ তায়ালাই একক ভাবে জানেন।

স্বয়ং কখনও কখনও উহা হতে যে রাসূলকে যতটা জানিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করেন, তা হিকমত ও কল্যাণার্থে জানিয়ে থাকেন। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ ﴾

(الجن: ٢٦-٢٧)

অর্থাৎ তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী । উপরন্ত তিনি অদৃশ্যের বিষয় কারো কাছে প্রকাশ করেন না,তাঁর মনোনিত রাসূল ব্যতীত। (সূরা জ্বিনঃ ২৬-২৭)

তার অর্থ হল তিনি যাকে রিসালাতের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন, সে ব্যতীত ইলমে গায়েব কেউ জানতে পারবে না। সুতরাং তিনি যাকে কিছু ইলমে গায়েব জানিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করেন তাই জানিয়ে দেন। কেননা অলৌকিক জিনিষ দ্বারা তার নবুওয়াতের উপর প্রমাণ করবে, অদৃশ্যের সংবাদ যা আল্লাহ তাকে জানিয়ে দেন। আর এই জ্ঞান রাসূলকে দেয়া হয়, তিনি হয় ফেরেস্তা হন নতুবা মানুষ হন। আর এই দুই শ্রেণী ব্যতীত অন্য কেউ জানতে পারবে না, কারণ এ ব্যাপারে সীমাবদ্ধতার প্রমাণ রয়েছে।

অতএব আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের মধ্য হতে যাকে বাছাই করে নিয়েছেন, সে ব্যতীত যে ব্যক্তি যে কোন উপায়ে ইলমে গায়েবের দাবী করবে, সে মিথ্যাবাদী ও কাফির। চাই সে উহা দাবী করবে, হাতে কিছু লিখে পড়ার মাধ্যমে অথবা পিয়ালায়, অথবা গণনা করে অথবা যাদুর মাধ্যমে অথবা জ্যোতির্বিদ্যার মাধ্যমে, ইত্যাদি। আর ইহা সংঘটিত হয় কিছু সংখ্যক কবিরাজ ও মিথ্যাবাদীদের নিকট থেকে, হারানো বস্তু এবং অজানা বস্তুর সংবাদ সংগ্রহ করে। আর কিছু রোগের কারণসমূহ থেকে। তারা বলে, অমুক ব্যক্তি তোমার জন্য এই কাজ করেছে তার পর তুমি সে কারণে অসুস্থ হয়েছ। একমাত্র ইহা জিন্ন এবং শয়তানকে ব্যবহার করে বলে থাকে। আর তারা প্রকাশ করে যে, এ সব বার্তা হাসিল হয়, এই এই বস্তুর মাধ্যমে, যা মূলতঃ ধোকা এবং গজামিল মাত্র।

قال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ والكهان كأن يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه من السمع وكانوا يخلطون الصدق بالكذب – إلى أن قال من هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة: فواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموضع – ومنهم من يطير به الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهما

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন (মাজমুআতু তুাওহীদ পৃঃ ৭৯৭-৮০১) গণকরা, যেমন তাদের কারো সাথে থাকে শয়তানদের মধ্য হতে একজন সাথী, সে তাকে অনেক অজানা বস্তুর সংবাদ দিয়ে থাকে, যা সংগ্রহ করে

আকাশের ঘাটি থেকে চোরাই পথে। আর তারা মিথ্যার সাথে সত্যকে সংমিশ্রণ করে থাকে। তিনি আরও বলেন, আর তাদের মধ্যে কারো কাছে শয়তান খাদ্য নিয়ে আসে, যেমন ফল, মিষ্টি ইত্যাদি। যা ঐ স্থানে নেই। আর তাদের মধ্যে এমন কেউ থাকে, যাকে জ্বিন উড়িয়ে নিয়ে যায় মক্কা অথবা বায়তুল মুকাদ্দাস ইত্যাদি স্থানে। সমাপ্ত।

আর কখনও তারা সংবাদ দেয় তারকা বিদ্যার মাধ্যমে আর তা হচ্ছে, আকাশের বিভিন্ন অবস্থা থেকে জাগতিক ঘটনাবলীর প্রমাণ বা ফায়সালা গ্রহণ করা।

যেমন ঝড় হওয়ার সময়কাল ও বৃষ্টি আসা এবং তাপমাত্রার পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়াদী। যে মর্মে তারা ধারণা রাখে যে এগুলো জানা যায় তারকারাজী তার কক্ষপথে চলার মাধ্যমে ও তার একত্রিত হওয়া এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার মাধ্যমে।

আর তারা বলেঃ যে ব্যক্তি বিবাহ করবে এই এই তারকা আকাশে উদিত হলে, তার জন্য এই এই অর্জিত হবে। আর যে ব্যক্তি এই তারকা দেখে ভ্রমণ করবে তার জন্য এই এই লাভ হবে। আর যে ব্যক্তি এই তারকা উদিত হলে জন্ম গ্রহণ করবে তার জন্য এই সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য হবে। যেমন কোন কোন নিম্নমানের পত্রিকায় প্রচার করা হয় রাশিফলের বিভিন্ন উপকারিতা অপকারিতার কথা।

আর কোন কোন অজ্ঞ ও দুর্বল ঈমানের লোক এসব জ্যোতির্বিদদের কাছে গিয়ে তাদের জীবনের ভবিষ্যত এবং

এসময় তাদের কি ঘটবে এবং তার বিবাহও ইত্যাদি মর্মে জিজ্ঞাসা করে থাকে। আর যে ইলমে গায়েব দাবী করবে অথবা গায়েবের ইলম দাবীকারীকে বিশ্বাস করবে সে মুশরিক; কাফির। কেননা সে আল্লাহর বৈশিষ্ট্যসমূহের একটিতে সমকক্ষতা দাবী করছে। আর তারকারাজী অনুগত সৃষ্টি, যার কোন কিছু করার শক্তি নেই এবং সে শুভ অশুভ জীবন মরণ কোনটার উপর ইংগীত করতে পারে না। এ সমস্ত শয়তানের কাজ যারা আকাশের ঘাটি থেকে চোরাই পথে সংগ্রহ করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যাদু জ্যোতিষী, গনক: এ সমস্ত বিষয় শয়তানী কাজ ও হারাম। আকীদাকে ত্রুটিযুক্ত করে কিংবা বিনষ্ট করে। কেননা এ সমস্ত কাজ শিরকী বিষয় ব্যতীত সংঘটিত হয় না।

একঃ যাদু বলা হয় এমন জিনিষকে যা কিছু গোপন ও সুক্ষ্মঃ যাদুকে সেহর এই জন্যই বলা হয়। কেননা ইহা গোপন বিষয় দ্বারা করা হয়, যা দৃষ্টি শক্তি দ্বারা অনুভব করা যায় না। আর এটা ঝাড়ফুক, এমন বাক্য বা মন্ত্র যা বলা হয় ঔষধপত্র ও সেবনের বস্তু । আর এর প্রভাব আছে। যার প্রভাব অন্তর ও শরীরে ক্রিয়া করে। তারপর অসুস্থ করে এবং মেরে ফেলে। আর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায় এর প্রভাব আল্লাহর সৃষ্টিগত ও ভাগ্যলিপি অনুযায়ী হয়ে থাকে এবং এটা শয়তানী

কাজ। আর এমন অনেক যাদু আছে যে গুলো শিরক ব্যতীত কার্যকর করা সম্ভব নয়। আবার শয়তানী আত্মার অসীলা ব্যতীত যাদু করের স্বার্থ অর্জিত হয় না। এ জন্যই শরীয়তের বিধান দাতা যাদুকে শিরক এর সাথে সংযুক্ত করেছেন। এই প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

(اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: وما هي قال الإشراك بالله والسحر)

অর্থাৎ তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিষ থেকে বেঁচে থাক। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ঐ ধ্বংসাত্মক বস্তুগুলি কি? তিনি জবাবে বললেন, ১। আল্লাহর সাথে শিরক করা। ২। যাদু করা (বুখারী ও মুসলিম)

অতএব যাদু দুটি কারণে শিরকের অন্তর্ভুক্তঃ

১। যাদু বিদ্যায় শয়তানকে ব্যবহার করা হয়। তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। কোন কোন সময় শয়তান যে সব কাজ পছন্দ করে সে সব কাজ সম্পাদন করে তার নৈকট্য লাভ করতে হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শয়তান যেন যাদু করের কাজ করে দেয় এবং তার উদ্দেশ্য হাসিলে সচেষ্ট হয়।

আল্লাহ বলেনঃ

﴿ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ (البقرة: ١٠٢)

কিন্তু শয়তানরা কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত। (সূরা বাকারাঃ১০২)

২। যাদু বিদ্যায় এলমে গায়েবের দাবী করা হয়, যাদু করের যাদুবিদ্যা অর্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার অংশীদারিত্বের দাবী করা হয়, এটা নি:সন্দেহে শিরক এবং কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ ﴾(البقرة: ١٠٢)

অর্থাৎ তারা ভাল করেই জানে যে, যে কেউ যাদু অবলম্বন করে তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই।(সুরা বাকারাঃ ১০২) আর অবস্থা যখন এই হবে তখন নিঃসন্দেহে যাদু কুফর ও শিরকের অন্তর্ভুক্ত, যা সঠিক আক্বীদাহ্ বিনষ্ট করে দেয় এবং যাদু চর্চাকারী হত্যার যোগ্য হবে। যেমন বড় বড় সাহাবীদের ﷺ একটি দল হত্যা করেছেন। আর মানুষেরা যাদুকর এবং যাদুবিদ্যাকে সহজ করে দেখেছে এমন কি অনেক সময় উহাকে গর্বের বিষয় হিসেবে গন্য করেছে।

আর যাদুকরদেরকে পুরুস্কার দিয়েছে এবং তাদেরকে উৎসাহিত করেছে। আর যাদুকরদের জন্য বিভিন্ন বৈঠক, মাহফিল এবং প্রতিযোগীতার অনুষ্ঠান সমূহের ব্যবস্থা করে। আর সেখানে উপস্থিত হয় হাজার হাজার ভ্রমণকারী ও উৎসাহী জনগণ। আর এটা দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতার ও আক্বীদার বিষয়ে অবহেলার কারণে যাতে বেকারদের সুযোগ করে দেয়া হয় মাত্র।

দুইঃ জ্যোতির্বিদ্যা ও গণনা করাঃ

উভয়টি এলমে গায়েব জানা ও অদৃশ্য কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার দাবী করা উদাহরণত: এমন বিষয়ে সংবাদ দেয়া যা পৃথিবীতে অচিরেই ঘটবে এবং অর্জিত হবে এবং হারানো বস্তুর স্থান কোথায় তা বলে দেয়া। আর উহা শয়তানদের সাহায্য নেয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে, যারা আকাশ থেকে কান পেতে চুরি করে থাকে। আল্লাহ তায়ালা তাদের মর্মে বলেনঃ

﴿ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴾ (الشعراء: ٢٢١-٢٢٣)

অর্থাৎ আমি আপনাকে বলব কি? যে শয়তানরা কার নিকট অবতরন করে, তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক মিথ্যাবাদী গুনাহগারের উপর। তারা শ্রুত কথা এনে দেয় এবং তাদের অধিকাংশ মিথ্যাবাদী। (সূরা শো'আরা ঃ ২২১-২২৩)

আর উহা শয়তান, ফিরিস্তাদের কথা থেকে কিছু চুরি করে থাকে, অতঃপর সে তা কাহিনের কানে পৌছিয়ে দেয়, আর সে জ্যোতিষী এই কথার সাথে আরো শত মিথ্যা কথা মিলিয়ে নিয়ে বলে থাকে। তারপর এই একটি কথা আকাশ থেকে শুনে থাকে বিধায়, লোকেরা এগুলিকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। অথচ আল্লাহ হচ্ছেন ইলমে গায়েব বা অদৃশ্য জ্ঞানের একচ্ছত্র অধিকারী। অতএব যে ব্যক্তি গণনা বা ভবিষ্যদ্বানী দ্বারা আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে অংশীদারীত্বের দাবী

করে অথবা এর দাবীদারকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, সে মুলতঃ এমন বিষয়ে আল্লাহর সাথে (সৃষ্টিকে) শরীক বানায়, যা একমাত্র আল্লাহর বৈশিষ্ট্য হিসেবেই গন্য। শয়তানের সাথে সংশিষ্ট অনেক গণকরাই শিরক থেকে মুক্ত নয়। কেননা শয়তান সে সব কাজ পছন্দ করে যে সব কাজ সম্পাদন করে নৈকট্য লাভ করা হয়। অতএব এটা রুবুবিয়্যাতে শিরক। কেননা ভবিষ্যত বাণীর মাধ্যমে আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে অংশীদারীত্বের দাবী করা হয়। এমনিভাবে অলুহিয়্যাতের শিরক হল যার অর্থ কোন ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নৈকট্য অর্জন করা। এই প্রসঙ্গে নাবীজীর বাণী যা আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত (নাবী ﷺ)বলেন=

(من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জ্যোতিষীর কাছে আসলো, অতঃপর জ্যোতিষী যা বলল তা সত্য বলে বিশ্বাস করলো, সে মূলতঃ মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর যা নাযিল করা হয়েছে তাকেই অস্বীকার করলো। (আবু দাউদ)

যেসব জিনিষ থেকে সতর্ক করা এবং সতর্ক থাকা আবশ্যকঃ

নিশ্চয় যাদুকররা, জ্যোতিষীরা ও গনকরা জনগণের আক্বীদা সমূহের সাথে মিশে থাকে চিকিৎসকদের ন্যায় আত্মপ্রকাশ করে। অতঃপর রোগীদেরকে গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করতে

বলে যে, এই গুন বিশিষ্ট মেষ অথবা মুরগী যবাই করতে হবে অথবা তারা তাদের জন্য শিরকী মন্ত্র ও শয়তানী তাবীজ কবজ সংরক্ষিত পদ্ধতিতে লিখে দেয়, আর বলে যে তারা এগুলি তাদের গলায় ঝুলাবে অথবা সিন্দুক অথবা বাড়ীতে রাখতে হবে। আবার অন্যরা নিজেকে বস্তুর সংবাদ দাতা ও হারানো বস্তুর স্থান নির্ধারণকারী হিসেবে প্রকাশ করে। এইভাবে যে, তার কাছে অজ্ঞ লোকেরা আসে এবং হারানো বস্তু সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অতঃপর সে তাদেরকে সে বস্তু সম্পর্কে অবহিত করে অথবা সে তা তার সহযোগী শয়তানদের দ্বারা তাদের কাছে উপস্থিত করে দেয়।

আবার কেউ কেউ নিজেকে অলী হিসেবে প্রকাশ করে, যার অলৌকিকতা ও কারামাত রয়েছে। যেমন, আগুনে প্রবেশ করলেও তার উপর আগুনের কোন প্রভাব পড়ে না। নিজেকে অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে অথবা নিজেকে গাড়ীর চাক্কার নীচে ফেলে দেয় কিন্তু তা তার উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। অথবা উহা ছাড়াও নানা ধরনের অলৌকিকতা যা বাস্তবে যাদু। তথা শয়তানের কাজ সে ফিতনার জন্য ওদের মাধ্যমে হয়ে থাকে। অথবা ইহা ভেলকীবাজী বিষয়, যার কোন অস্তিত্ব নেই। বরং ইহা গোপনীয় কৌশল যা তারা লোক চোখে দেখিয়ে থাকে। যেমন ফেরাউনের যাদুকররা লাঠি এবং রশি দিয়ে দেখিয়েছেল।

قال شيخ الإسلام في مناظرته للسحرة البطائحية الأحمدية (الرفاعية) قال يعني شيخ البطائحية) ورفع صوته نحن لنا أحوال وكذا وكذا وادعى الأحوال والخارقة كالنار وغيرها واختصاصهم بها وأنهم يستحقون تسليم الحال إليها لأجلها- قال شيخ الإسلام فقلت ورفعت صوتي وغضبت؛ أنا أخاطب كل أحمدي من مشرق الأرض إلى مغربها أي شيئ فعلوا في النار فأنا أصنع مثل ما تصنعون ومن احترق فهو مغلوب وربما قلت فعليه لعنة الله ولكن بعد أن تغسل جسومنا بالخل والماء الحار فسألني الامراء والناس عن ذلك فقلت لأن لهم حيلاً في الإتصال بالنار يصنعونها من أشياء من دهن الضفادع وقشر النارنج وحجر الطلق فضج الناس بذلك- فأخذ يظهر القدرة على ذلك فقال؛ أنا وأنت نلف في بارية بعد أن تطلى جسومنا بالكبريت فقلت فقم أخذت أكرر عليه في القيام إلى ذلك فمد يده يظهر خلع القميص؛ قلت لا حتى تغتسل بالماء الحار والخل فأظهر الوهم على عادتهم فقال من كان يحب الأمير فليحضر خشباً، أو قال حزمة حطب فقلت هذا تطويل وتفريق للجمع ولا يحصل به مقصود بل قنديل يوقد وأدخل **أصبعي وأصبعك** فيه بعد الغسل ومن احترقت أصبعه فعليه لعنة الله أو قلت فهو مغلوب فلما قلت ذلك تغير وذل انتهى

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা তাঁর মুনাযারায় বলেছিলেন, যেটি ঘটেছিল বাতাইহিয়্যাহ আহমাদিয়াহ (রিফাইয়াহ)সম্প্রদায়ের যাদুকরদের সাথে। বাতাইহিয়্যাহদের নেতা উচ্চস্বরে বলেছিল, আমাদের এই রূপ আছে আর অলৌকিক অবস্থা দাবী করল যেমন আগুন ইত্যাদি এবং তার সাথে তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট রয়েছে। তারা এসব বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তিত্ব যাদের উপর এগুলোর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

শায়খুল ইসলাম বলেন, অতঃপর আমি রাগান্বিত হয়ে উচ্চ কণ্ঠে বললামঃ আমি পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সকল আহমদী সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলছি, আগুনের মাঝে তারা যা করবে আমিও তা করতে প্রস্তুত। তবে যে পুড়ে যাবে সে পরাজিত। কখনও একথাও বলেছি বলে মনে হচ্ছে যে, তার উপর আল্লাহর অভিশাপ হোক। তবে তা হবে সিরকা ও গরম পানি দ্বারা আমাদের শরীরকে ভাল করে ধৌত করার পর। অতঃপর নেতৃবর্গ ও সাধারণ উপস্থিত জনগণ উহার কারণ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তদুত্তরে বললাম: কেননা আগুনের সাথে মিশে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন কৌশল রয়েছে, যা বিভিন্ন বস্তু থেকে তৈরী করে থাকে। যেমন ব্যাঙের তৈল, নারিকেলের খোশা ও গুড়িপাথর এই শুনে মানুষেরা হৈচৈ শুরু করল। এ সময় ঐ পদ্ধতির উপর ক্ষমতা প্রকাশ করতে

লাগল। আর বললঃ আমি ও আপনি গন্ধক এর প্রলেপ শরীরে মাখানোর পর আমরা চাটাইতে জড়িয়ে যাব। ততক্ষণাত আমি (ইবনু তাইমিয়্যাহ) বললাম: তবে দাড়াও। আর আমি বারবার তাকে ঐ কাজের জন্য প্রস্তুত হতে বললাম। তখন সে তার হাত বাড়িয়ে জামা খোলার ভান করল। আমি তাকে বললাম: এভাবে হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি গরম পানি ও সিরকা দ্বারা শরীর ডলে গোসল করবে । তাদের চিরাচরিত অভ্যাসের উপর ধ্যান করে বলল: যে ব্যক্তি আমীরকে ভালবাসে সে অবশ্যই কাঠ সংগ্রহ করবে। অথবা বলল খড়ির বোঝা নিয়ে আসবে। তখন এই শুনে আমি বললাম: এটা দীর্ঘায়িত করা ও উপস্থিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার কৌশল, এতে উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। বরং সহজ পদ্ধতি হল হারিকেন জালানো হবে এবং আমার ও তোমার আঙ্গুল ধৌত করার পর তাতে প্রবেশ করাব। এতে যার আঙ্গুল পুড়ে যাবে তবে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ অথবা বললাম: সে পরাজিত। যখন আমি একথা বললাম তখন অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল এবং অপমানিত হল। সমাপ্ত। (মাজমুউল ফাতাওয়া–১১খণ্ড ৪৬৪-৪৬৫)

ইহা বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, এই দাজ্জাল লোকেরা এ ধরণের গোপনীয় কৌশল দ্বারা জনগনের কাছে মিথ্যা প্রচার করে থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কুরবাণী, নযর নেওয়াজ ও উপঢৌকনসমূহ মাযার ও কবরস্থানে উপস্থিত করা এবং উহার তা'যিম করাঃ

নিঃসন্দেহে নাবী কারীম ﷺ শিরকের যাবতীয় পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। তিনি তা হতে চরম ভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন। আর উহার একটি হল কবর সম্পর্কিত বিষয়। তাতে ইবাদত করা থেকে এবং কবরবাসীদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকে রক্ষা করবে, এরূপ নীতিমালা নাবী ﷺ প্রণয়ন করে গেছেন উহা নিম্নরূপঃ

১। নাবী কারীম ﷺ আউলিয়া ও নেককার লোকদের মর্মে সীমাতিরিক্ত প্রশংসা করা হতে সাবধান করেছেন। কেননা উহা তাদের ইবাদতের দিকে নিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে তিনি ﷺ বলেছেনঃ

(إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو)

অর্থাৎ তোমরা বাড়াবাড়ি ও সীমা অতিক্রমের ব্যাপারে সাবধান থাক। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো (দ্বীনের ব্যাপারে) সীমালংঘন করার ফলে ধ্বংশ হয়ে গেছে। (আহমাদ, তিরমিজী, ইবনে মাযাহ)

তিনি ﷺ আরো বলেছেনঃ

(لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله)

অর্থাৎ তোমরা আমার মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করো না, যেমনি ভাবে প্রশংসা করেছিল নাসারারা মরিয়মের পুত্র ঈসা عليه السلام এর। আমি আল্লাহ তায়ালার বান্দা মাত্র। তাই তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং তারই রাসূল বলবে। (মুসলিম)

২। তিনি ﷺ কবরের উপর ঘর বানানো হতে সতর্ক করে দিয়েছেন।

كما روى أبو الهياج الأسدي قال لي على بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً إلا سويته.

অর্থাৎ যেমন আবুল হাইয়াজ আল আসদি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত আলী বিন আবী তালিব رضي الله عنه আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে একটি কাজ করতে পাঠাব না, যে কাজ করতে স্বয়ং রাসূল ﷺ আমাকে পাঠিয়েছিলেন? তা হচ্ছে যে কোন প্রতিকৃতি পাবে তা মিটিয়ে দিবে এবং যে কোন উচু কবর পাবে সমতল করে দিবে। (মুসলিম)

এবং তিনি ﷺ কবর পাকা করতে ও তার উপর ঘর বানাইতে নিষেধ করেছেনঃ

عن جابر ﷺ قال نهى رسول الله ﷺ عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه بناء

অর্থাৎ জাবির ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ কবর পাকা করতে তার উপর বসতে এবং তার উপর ঘর বানাতে নিষেধ করেছেন।

৩। আর তিনি ﷺ কবরের পার্শ্বে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেনঃ

عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله ﷺ طفق يطرح خميصة له عن وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذالك (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً

অর্থাৎ হযরত আয়েশা ﷺ হতে আরো একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, যখন রাসূল ﷺ এর মৃত্যু ঘনিয়ে আসলো তখন তিনি নিজের মুখমন্ডলকে স্বীয় চাদর দিয়ে ঢেকে ফেলতে লাগলেন। আবার অস্বস্তিবোধ করলে তাঁর চেহারা থেকে সরিয়ে ফেললেন, এমন অবস্থায় তিনি বললেন, ইহুদী নাসারাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। তারা তাদের নাবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছে। তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে রাসূল ﷺ সতর্ক করে দিয়েছেন। কবরকে ইবাদত

খানায় পরিনত করার আশংকা না থাকলে তার কবরকে উঁচু করা হতো। (বুখারী, মুসলিম)
তিনি আরো বলেছেনঃ
(ألا وأن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.)

অর্থাৎ সাবধান তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো তাদের নাবীদের কবরকে মসজিদে পরিনত করেছে। সাবধান তোমরা কবরকে মসজিদে পরিনত করো না। আমি তোমাদেরকে একাজ করতে নিষেধ করছি। (সহীহ মুসলিম)

এখানে মসজিদ বানানোর অর্থ যেখানে নামায পড়া হয়, যদিও সেখানে মসজিদ বানানো না হোক। অতএব এমন প্রতিটি স্থানের নামই মসজিদ, যেখানে নামায আদায় হয়। যেমন নাবী কারীম ﷺ বলেছেনঃ
(جعلت لي الأرض مسجداً و طهوراً)

পৃথিবীর সকল স্থানকেই আমার জন্য মসজিদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে, এবং পবিত্র করে দেয়া হয়েছে। (বুখারী)

অতঃপর কবরের উপর যদি ঘর বানানো হয় তবে বিষয়টি আরো কঠিন।

আর এ বিষয়ে অধিকাংশ মানুষ বিরোধীতা করে এবং অমান্য করে যা থেকে তিনি ﷺ (সাবধান) নিষেধ করেছেন,

অতঃপর তারা এই কারণে বড় শিরকে নিপতিত হয়। তারা কবরের উপর মসজিদ, আস্তানা, বাসস্থান তৈরী করে, আর তারা সেখানে মাযার তৈরী করে। তার নিকটে সব ধরনের শিরকে আকবরের অনুশীলন করেঃ তার জন্য যবেহ এবং তাদের কাছে দোয়া চাওয়া তাদের দ্বারা উদ্ধার প্রার্থনা করা , তাদের উদ্দেশ্যে মান্নত মানা ইত্যাদি।

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن جمع بين سنة رسول الله ﷺ في القبور وما أمربه ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضاداً للآخر مناقضا له بحيث لايجتمعان أبداً

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ) বলেন, যে ব্যক্তি কবর সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আদেশ ও নিষেধ সম্বলিত রেখে যাওয়া সুন্নাতসমূহকে ও সাহাবায়ে কিরামদের আমলকে এক পাল্লায় রাখবে এবং বর্তমান যুগের অধিকাংশ মানুষ যারা কবর কেন্দ্রীক কর্ম কাণ্ডে লিপ্ত, তাদের আমলকে ভিন্ন পাল্লায় রাখবে, তাহলে নিঃসন্দেহে তার কাছে ফলাফল এ দাড়াবে যে, একটি অপরটির একেবারেই বিপরীত মুখী। এ দুয়ের মাঝে কোন দিনই সমন্বয় সাধন হতে পারে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন, তারা কবরের নিকট নামায আদায় করে। রাসূল ﷺ কবরকে মসজিদে পরিনত করতে নিষেধ করেছেন,

তারা এর বিরোধিতা করে মসজিদ বানায়। একে প্রদর্শনীয় বস্তু হিসেবে প্রচার করে। অবস্থা এতদূর গড়িয়েছে যে, এ সমস্ত পথ ভ্রষ্ট ও পথ ভ্রষ্টকারীরা কবরকে কাবা শরীফ, মসজিদে নববী ও মজজিদে আক্‌সা আল্লাহর এই ঘরসমূহের সম আসনে বসাতেও দিধাবোধ করেনি। তিনি ﷺ কবরে বাতি জ্বালাতে নিষেধ করেছেন। তারা এর উপর ধুপবাতি মোমবাতি জ্বালায়, বরং এগুলোকে কবরের নামে ওয়াকফ করে। তিনি বিভিন্ন কবরকে উৎসব স্থলে পরিনত করতে নিষেধ করেছেন। তারা কবরকে বিভিন্ন উৎসব অথবা তার চেয়ে বড় সমাবেশ করার মত কবরের পাশে সমবেত হয়। এখানে স্মরনীয় যে, নাবী কারীম ﷺ কবরকে সমতল করে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেনঃ যেমন ইমাম মুসলিম (রহ) তার সহীহ গ্রন্থে আবুল হাইয়াজ আল আসাদী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ একদা হযরত আলী বিন আবী তালিব رضي الله عنه আমাকে বললেন:

ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته

আমি কি তোমাকে এমন একটি কাজ করতে পাঠাবো না? যে কাজ করতে স্বয়ং রাসূল ﷺ আমাকে পাঠিয়েছিলেন? তা হচ্ছে যে কোন প্রতিকৃতি পাবে, তা মিটিয়ে দিবে এবং যে কোন উঁচু কবর পাবে সমতল করে দিবে।

ইমাম মুসলিমের (রহ:) সহীহ গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে শুফাই বিন সমামাহ হতে আরও একটি বর্ণনায় এসেছে। তিনি বলেনঃ

كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفى صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوى ثم قال سمعت رسول الله ﷺ يأمر بتسويتها

আমরা রোম দেশের,বোদসা নামক দ্বীপে ফুযালা বিন উবায়েদ এর সাথে ছিলাম তখন আমাদের একজন সঙ্গীর মৃত্যু হলে, ফুযালা তাকে দাফন করার নির্দেশ দিলেন। (তাকে কবরস্থ করা হলো) তখন তিনি তাঁর কবরকে সমতল করলেন, অতঃপর বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি কবরকে সমান রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ উঁচু না রাখতে বলেছেন। অথচ কবর পূজকরা এই উল্লেখিত হাদীসদ্বয়ের চরম ভাবে বিরোধিতা করছে। কবরের উপর বাড়ীর মত উচু মাটির টিলা তৈরী করছে। তার উপর আবার গম্বুজ নির্মাণ করছে।

অত:পর সম্মানিত পাঠকগণ! এই বিরাট ব্যবধানের দিকে লক্ষ্য করুন যে ইতিপূর্বে কবর বিষয়ের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কি বিধান প্রবর্তন করেছেন এবং কি উদ্দেশ্যে কোন কোন কাজ করতে নিষেধ করেছেন। আর ঐ লোকেরা কি প্রবর্তন করেছে এবং কি উদ্দেশ্যে করছে। নি:সন্দেহে এতে অনেক বিপর্যয়কর ক্ষতি রয়েছে, যা মানুষের আয়ত্ব করার বাহিরে। তারপর তিনি (রহঃ) ঐ ক্ষতিকর

দিকগুলো বর্ণনা করেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি এ কথা বলেছেন: যে, নাবী কারীম ﷺ কবর যিয়ারত করা বৈধ করেছেন, এ উদ্দেশ্যে যে যিয়ারতের মাধ্যমে আখেরাতকে স্মরণ করা এবং দুয়ার মাধ্যমে কবরস্থ ব্যক্তির প্রতি এহসান করা, অনুগ্রহ করা ও তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং শান্তি চাওয়া হয়। অতএব যিয়ারতকারী তার পক্ষ থেকে নিজকে উপকৃত করেন ও মৃত ব্যক্তিকেও এহসান করে থাকেন। কিন্তু মুশরিক লোকেরা ঐ বিষয়কে পরিবর্তন করে দিয়েছে, আর দ্বীনের বিধানকে বিপরীত দিকে প্রবাহিত করেছে এবং মৃত ব্যক্তির কাছে যিয়ারতের উদ্দেশ্যকে শিরকে পরিনত করেছে ও তার কাছে দোয়া করছে ও তার দ্বারা দোয়া চাচ্ছে, ও তাদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য দুয়া করছে ও তার কাছে বরকত চাচ্ছে, তাদের জন্য তাদের শত্রুর উপর বিজয় কামনা করছে ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই তারা নিজেদের ক্ষতি করছে ও মৃত ব্যক্তিরও ক্ষতি করছে। আল্লাহ তাদের জন্য যা বৈধ করে রেখেছেন দোয়া করা, তাদের উপর করুনা কামনা করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত করা ছাড়া আর কিছু করে না। সমাপ্ত।(ইগাছাতুল লাহফান: ২১৪-২১৫-২১৭)

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, যে নিঃসন্দেহে মাজারসমূহে নযর-নিয়াজ ও কুরবানী উপস্থাপন করা শিরক আকবর বা বড় শিরক। এ সবের কারণ হচ্ছে নাবী কারীম

ﷺ এর আদর্শের বিপরীত চলা। তার আদর্শ হল, কোন স্থানে কবর থাকা অবস্থায় তার উপর ঘর নির্মাণ না করা এবং তার আশ-পাশে মসজিদ তৈরী না করা, কেননা যখন তার উপর গম্বুজ তৈরী করা হয় ও এর চতুর্দিকে মসজিদ নির্মাণ ও যিয়ারতের জায়গা করে দেয়া হয়, তখন অজ্ঞলোকেরা এই বিশ্বাস করে যে, তথায় শায়িত ব্যক্তিরা উপকার করে, অথবা ক্ষতিসাধন করার ক্ষমতা রাখে। তারা এও বিশ্বাস করে যে, যে তাদের কাছে উদ্ধার প্রার্থনা করে, তাদেরকে উদ্ধার করতে পারে এবং যে তাদের কাছে আশ্রয় তলব করে, তার মনবাঞ্চনা অভাব পূরণ করতে পারে, ফলে তার উদ্দেশ্যে নানান ধরনের নযর ও কুরবানী উপস্থাপন করে থাকে। এই মহা ক্ষতিকর প্রচলন থেকে বাঁচার জন্য নাবী কারীম ﷺ এই দোয়া করেছিলেনঃ

(اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد)

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার কবর পূজার মূর্তিতে পরিনত করো না। (ইমাম মালেক ও আহমদ)

এই দোয়াটি তিনি করে এ কথাই অবগত করিয়েছেন যে, তাঁর কবর ব্যতীত অন্যান্য কবরে এমন কাজ প্রতিফলিত হবে, অনেক ইসলামী দেশে নাবীর এ ভবিষ্যৎবানী বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর কবরকে তাঁর দোয়ার বরকতে আল্লাহ তায়ালা পূর্ণ হিফাযত করে রেখেছেন, যদিও কোন

কোন অজ্ঞ ও খুরাফি লোকদের কারণে তাঁর মসজিদে কিছুটা শরীয়ত পরিপন্থী কাজ মাঝে মধ্যে ঘটে থাকে। কিন্তু তারা আল্লাহর নাবীর কবর পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হয় নাই। কেননা তাঁর ﷺ কবর তাঁর ঘরেই রয়েছে মসজিদে নয়। আর ইহা দেওয়াল বেষ্টিত। যেমন আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ) নুনিয়া নামক কবিতায় উল্লেখ করেছেনঃ

فاستجاب رب العالمين دعاءه — وأحاطه بثلاثة الجدران

অতঃপর তাঁর দুয়া রাব্বুল আলামীন কবূল করেন, আর তাকে (কবরকে) তিন দেওয়াল দ্বারা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্মরণীয় প্রতিকৃতি ও মূর্তির তা'যীম করার বিধান।

التماثيل এর এক বচন تِمْثَال যা কোন মানুষ অথবা পশু কিংবা অন্যান্য আত্মা বিশিষ্ট বস্তুর গঠনের উপর দেহ বিশিষ্ট মূর্তিকে বুঝায়। আর نصب নুসুব মূলতঃ নিদর্শন ও পাথরসমূহকে বলা হয়। মুশরিকরা নেতা, অথবা সমাজপতির স্মৃতি জীবন্ত রাখার উদ্দেশ্যে তাদের মূর্তির পার্শ্বে পশু যবাহ করত।

মহা নাবী ﷺ প্রাণ বিশিষ্ট জিনিষের ছবি তৈরী করা থেকে হুশিয়ার করে দিয়েছেন। বিশেষ করে মানুষের

মধ্যেকার মহান ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকদের ছবি নির্মাণ করা থেকে। যেমন গুনী-জ্ঞানী, রাজা- বাদশাহ ধর্মজাযক, নেতা ও সমাজপতিদের ছবি করা থেকে। হয় এই ছবি অংকন পদ্ধতিতে, সাইনবোর্ডের উপর হোক অথবা কাগজ কিংবা দেয়াল বা কাপড়ের উপর হোক অথবা বর্তমান যুগে প্রচলিত ক্যামেরার মাধ্যমে হোক। অথবা ক্ষুদাই পদ্ধতিতে হোক ও প্রতিকৃতির আকৃতিতে মূর্তি বানানো হোক। এবং তিনি ﷺ দেয়াল ও ইত্যাদিতে ছবি ঝুলাইতে নিষেধ করেছেন । আর প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন যার মধ্যে স্মরণীয় মূর্তি অন্তর্ভুক্ত। কেননা উহা মানুষকে শিরকের পথে নিয়ে যায়। পৃথিবীতে প্রথমে শিরক শুরু হয় ছবির কারনেই। এরপর তা থেকে মূর্তি তৈরী হয়। আর উহা এভাবে চালু হয় যে, হযরত নূহ عليه السلام এর গোত্রের মধ্যে কিছু নেককার লোক ছিলেন, তারা যখন মারা গেলেন, তাদের মৃত্যুতে তাদের গোত্রের আত্মীয় স্বজনরা চিন্তিত হলো। অত:পর শয়তান তাদেরকে পরামর্শ দিল। তারা (মৃত ব্যক্তিরা) যেখানে যেখানে অবস্থান করত সেই সেই স্থানে নাম উল্লেখসহ ওদের মূর্তি বানাতে বলল। অত:পর তারা সেই পরামর্শানুযায়ী কাজ করল। তবে এ সময় তারা মূর্তির ইবাদত করা থেকে বিরত থাকল। শেষ পর্যন্ত যখন এই লোকেরা মারা গেল, পরবর্তী

বংশধরের নিকট পূর্বের ঐ লোকদের যাবতীয় ইতিহাস অজানা হয়ে গেল, তখন এদের পূজা করা শুরু হল।

আল্লাহ যখন তাঁর নাবী নূহ ﷺ কে প্রেরণ করলেন, তখন তিনি মূর্তির কারণে প্রচলিত হওয়া শিরক থেকে মানুষকে নিষেধ করতে লাগলেন। লোকেরা তার এই দাওয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতী জানালো এবং ঐ বানানো মূর্তি, যেটি লোকেরা পূজার মূর্তিতে রূপ দিয়েছিল, তার ইবাদত করার উপর অটল থাকতে লাগল। তাদের কথা আল্লাহ তার ভাষায় বর্ণনা করেনঃ

﴿ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ (نوح: ٢٣)

অর্থাৎ তারা বলছে তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওদ্দা সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসরকে। (সূরা নূহঃ২৩)

আর এই নামগুলি ঐ লোকদের, যাদের স্মরনার্থে ও তা'যিম করার জন্য তাদের আকৃতির উপর প্রতিকৃতি তৈরী করা হয়।

সুতরাং আপনি লক্ষ করুন তাদের ঐ স্মরনীয় মূর্তিগুলি স্থাপনের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে শিরক করে ও তাঁর রাসূলগণের বিরোধিতা করার কারণে আসল ঘটনা কোন দিকে মোড় নিয়েছিল। ঐ সমস্ত কারণে, তাদেরকে তুফান

দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল, আর আল্লাহর পক্ষ থেকে ও সৃষ্টিকুলের পক্ষ থেকে তাদের মর্মে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে, যা তাদের মূর্তি স্থাপন ও ছবি লটকানোর ক্ষতির প্রতি ইংগীত বহন করছে। এই জন্য নাবী ﷺ ছবি তোলা ব্যক্তিদের প্রতি অভিশাপ করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা কিয়ামতের দিন সকলের চেয়ে বেশী শাস্তি ভোগ করবে। তিনি ﷺ প্রতিকৃতি মিটিয়ে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ইহাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, যে ঘরে ছবি থাকবে সে ঘরে রহমতের ফিরিস্তারা প্রবেশ করবে না। ঐ সমস্ত ছবির কূফল ও তার মারাত্মক প্রভাব এই উম্মতের আক্বীদার উপর পড়বে। কেননা পৃথিবীতে সর্ব প্রথম শিরক শুরু হয়েছিল ছবি তৈরীর কারণে। হয় এ ছবি মূর্তি হিসেবে ও প্রতিকৃতি হিসেবে বিভিন্ন অফিস আদালতে ও সংসদ ভবনে হোক অথবা মাঠে ময়দানে হোক, কিংবা বাগানসমূহে , যেখানেই হোক শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। কারণ মানুষকে শিরকের পথে ও আক্বীদা বিনষ্ট করার দিকে নিয়ে যায়। বর্তমান যুগে কাফিরেরা এ কাজ করে থাকে। কেননা তাদের নির্দিষ্ট কোন আক্বীদা নেই যা হেফাজত করার প্রয়োজন হবে।

অতএব মুসলমানদের জায়েয হবে না, কাফেরদের মত এ কাজ করা এবং তাদের সাথে এ কাজে অংশগ্রহণ

করা। আপন আক্বীদাকে ঠিক রাখার জন্য যা তাদের শক্তি ও মর্যাদার মূল চাবিকাঠি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দ্বীন সম্পর্কে হাসি-ঠাট্টা তার মর্যাদা হানি করার বিধানঃ

দ্বীন সম্পর্কে হাসি ঠাট্টা করা ইসলামকে পরিত্যাগ করা এবং দ্বীন থেকে সম্পুর্ণরূপে বের হয়ে যাওয়ার নামান্তর। আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়ে বলেনঃ

﴿ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ (التوبة: ٦٥-٦٦)

অর্থাৎ আপনি বলুনঃ তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর আয়াত সমূহের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা করো না, তোমরা কাফির হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। (সূরা তাওবাহঃ৬৫-৬৬)

উক্ত আয়াতটি ইঙ্গিত করে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালার সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা, রাসূলকে নিয়ে উপহাস করা এবং আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহকে ঠাট্টা করা কুফরী কাজ। এমনকি কেউ যদি এসব বিষয়ের কোন একটিকে উপহাস করে সে যেন সমস্ত বিষয়কে উপহাস করল। আর যা ঐ মুনাফিক লোকদের নিকট থেকে সংঘটিত হয়েছিল তা এই

যে, নিশ্চয় তারা রাসূল ﷺ কে ও তাঁর সাহাবায়ে কিরামকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছিল, ফলে উপরোল্লেখিত আয়াতটি নাযিল হয়। সুতরাং এসব বিষয়কে উপহাস করা একটা অপরটার সাথে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। তাই যারা আল্লাহর একত্ববাদকে তুচ্ছ মনে করে, আর তাকে বাদ দিয়ে মৃত ব্যক্তিদের আহবান করার উপর গুরুত্ব দেয় এবং যখন তারা আদিষ্ট হয় একত্ববাদ সম্পর্কে ও শিরক থেকে বাধা প্রাপ্ত হয়, তখন এটাকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ﴾ (الفرقان:٤١-٤٢)

অর্থাৎ তারা যখন আপনাকে দেখে তখন আপনাকে কেবল বিদ্রুপের পাত্ররূপে গ্রহণ করে , বলে, এই কি সে, যাকে আল্লাহ রাসূল করে প্রেরণ করেছেন? সে তো আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগণের কাছ থেকে সরিয়েই দিত। যদি আমরা তাদেরকে আকড়ে ধরে না থাকতাম। (সূরা ফুরকানঃ ৪১-৪২)

রাসূল ﷺ যখন তাদেরকে শিরক করতে নিষেধ করলেন, তখন তারা রাসূলকে উপহাস করল। সর্বদা মুশরিকেরা আম্বিয়া عليهم السلام দের দোষ বর্ণনা করত। যখন তারা তাদেরকে এ তাওহীদের দিকে আহবান জানাতেন, তখন তারা (কাফিররা) নাবীদেরকে বোকা, বিভ্রান্ত ও পাগল বলে

আখ্যায়িত করত, তাদের অন্তরে শিরক বড় হয়ে থাকার কারণে। আর এমনিভাবে পাবেন ঐ ব্যক্তিকে যার অন্তরে শিরক বাসা বেধে আছে। সে যখন কোন তাওহীদের দিকে আহবানকারীকে দেখবে, তখন সে উক্ত গুনাবলী উল্লেখ করে উপহাস করবে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ ﴾ (البقرة:١٦٥)

অর্থাৎঃ মানুষের ভিতরে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে তাঁর সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে। তারা আল্লাহকে ভালাবাসার মতই তাদেরকে ভালবাসে। (সূরা বাকারাঃ ১৬৫)

অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালবাসার মতই কোন সৃষ্টিকুলকে ভালবাসে সে ব্যক্তি মুশরিক। আল্লাহকে ভালবাসা ও আল্লাহর সাথে অন্য কোন কিছুকে ভালবাসা এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য করা একান্ত কর্তব্য। ঐ সমস্ত লোক যারা কবরকে পূজায় পরিণত করে তাদেরকে আপনি দেখতে পাবেন যে তারা আল্লাহর একত্ববাদ ও তার ইবাদত নিয়ে বিদ্রুপ করে। আর আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তার সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করে তাদেরকে সম্মান দেখায়। আবার জেনে বুঝে মিথ্যা শপথ করে অথচ সে জেনে বুঝে তার মুরব্বীর নামে মিথ্যা শপথ করতে সাহস পায় না। বিভিন্ন গোত্রের বহু সংখ্যক

লোককে এমনই দেখা যায় যে তাদেরই কেউ কেউ মনে মনে ধারণা করে: যদি শায়খের নিকট উদ্ধার প্রার্থনা করা হয়, চাই কবরের পার্শ্বে হোক অথবা অন্য কোথাও হোক। তবে উহা রাত্রির শেষ ভাগে মসজিদে আল্লাহকে ডাকার চেয়ে তার জন্য বেশী উপকারী হবে। আর যে বক্তি তার তরিকা থেকে ফিরে গিয়ে একত্ববাদের উপর চলে, তাকে সে বিদ্রূপ করে। তাদের অনেকেই মসজিদ পরিত্যাগ করে مشاهد বা ভ্রমণ কেন্দ্রসমূহ নির্মাণ করে। ইহা কেবল মাত্র আল্লাহকে তাঁর আয়াত সমূহকে ও তাঁর রাসূলকে তুচ্ছ মনে করে শিরককে সম্মান করা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। (মাজমুউল ফাতাওয়া ১৫খণ্ড ৪৮-৪৯পৃঃ)

লেখক বলেন: আর এরূপ কাজ কবর পূজকদের মাঝে বর্তমানে অহরহ ঘটছে।

ঠাট্টা বিদ্রূপ দু প্রকারঃ

প্রথম প্রকারঃ খোলাখুলি বিদ্রূপ করা। যেমন পূর্ব বর্ণিত আয়াত যে কারণে অবতীর্ণ হয়। তাদের কথা ছিল: আমরা আমাদের ক্বারীদের মত অতি পেট পূজারী ও অতি মিথ্যাবাদী এবং শত্রুদের মোকাবিলায় অতিভীত আর কাউকে দেখি নাই। বিদ্রূপকারীদের এ ধরণের আরো অনেক কথা: যেমন তাদের মধ্যেকার কেউ কেউ বলে, তোমাদের এ ধর্মটি পঞ্চম ধর্ম। আবার কেউ বলে: তোমাদের এ ধর্ম

অনিয়মতান্ত্রিক। আবার কেউ সৎকাজের আদেশদাতা ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধকারীদেরকে যখন দেখে, তখন বলে, তোমাদের কাছে দ্বীনের ধারক এসেছে। এটা তাদেরকে উপহাসমূলক বলে থাকে। এ ধরনের অসংখ্য বাক্য যেগুলো যাদের বর্ণনা প্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। তার চেয়েও অনেক রঙ্গের বড় বড় কথা।

দ্বিতীয় প্রকারঃ ইঙ্গিত সূচক বিদ্রুপ করা। এ এমনি বিদ্রুপ যা কুলবিহীন সাগরের সমতুল্য। যেমন বাকা চোখে দেখা, জিহ্বা বের করা, ঠোঁট বাকা করা এবং কোরআন অথবা হাদীস তেলাওয়াতের সময় ও সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার সময় হাত দ্বারা টিপ্পনি মারা। এ ধরনের কথা যা অন্যান্যরা বলে: নিশ্চয় ইসলাম বিংশ শতাব্দীর জন্য প্রযোজ্য নয় বা বর্তমান বিশ্বের জন্য যুগোপযুগী নয়। ইহা একমাত্র মধ্যযুগসমূহের জন্য চলে এবং তা প্রগতীশীল নয়। এতে শাস্তি বিধানের ব্যাপারে কঠোরতা ও বর্বরতা রয়েছে এবং এতে নারীদেরকে তাদের অধীকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। যেখানে তালাক বৈধ করেছে এবং একাধিক বিবাহ বৈধ করেছে এবং তাদের কথা: মানব রচিত আইন, মানুষের জন্য ইসলামের আইনের চেয়ে উত্তম। যে তাওহীদের দিকে আহবান জানায় ও কবর ও সামাধিস্থলে ইবাদত করা অস্বীকার করে তার মর্মে তারা বলে: এ ব্যক্তি

বিচ্ছিন্নতাবাদী অথবা মুসলিম জামাতকে বিভক্ত করতে চায়। অথবা বলে: এ ব্যক্তি ওয়াহাবী বা পঞ্চম মাযহাব। এ ধরনের যত কথা বলা হয় সবই দ্বীনকে ও দ্বীনের ধারকদেরকে গালি দেয়া এবং সঠিক আক্বীদাহ্‌কে বিদ্রুপ করা। لا حولا ولا وقوة إلا بالله আর উহার অন্তর্ভূক্ত তাদেরকেও বিদ্রুপ করা হয়, যারা নাবী কারীম ﷺ এর সুন্নাতকে আকড়ে ধরে থাকে। তারা বলে: ধর্ম শুধু লম্বা দাড়ীর মধ্যেই সীমিত নয়। এটা লম্বা দাড়িকে বিদ্রুপ করে বলা হয়। এ ধরনের লজ্জাবিহীন অনেক কথা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ

আল্লাহ প্রদত্ব আইন ব্যতীত বিচার- ফয়সালা করাঃ

আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান ও তাঁর ইবাদতের দাবী, তাঁর হুকুমের আনুগত্য করা, তাঁর শরীয়তের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং শরীয়তের ক্ষেত্রে মতবিরুদ্ধে ও শরীয়তের মৌলনীতিসমূহের বিষয়ে ও মামলা- মুকাদ্দামায় খুনের ব্যাপারে অধিকার আদায়ে ও সম্পদসহ অন্যান্য সমস্ত অধীকারের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাতের আনুগত্য করা অপরিহার্য্য। কেননা আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র সর্ব বিষয়ের বিধান দাতা ও তাঁর কাছেই রয়েছে বিচার ফয়সালার চাবিকাঠি। সুতরাং শাসক ও বিচারকদের উপর কর্তব্য আল্লাহ প্রদত্ব বিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনা

করা ও ফয়সালা করা। আর জনগণের উপর কর্তব্য কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিচার চাওয়া। আল্লাহ তায়ালা শাসকদের কর্তব্য মর্মে বলেন:

﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ ﴾ (النساء:٥٨)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে তোমরা যেন আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের বিচার মীমাংসা কর. তখন যেন মিমাংসা কর ন্যায় ভিত্তিক। (সূরা নিসাঃ৫৮)

আল্লাহ তায়ালা জনসাধারণের কর্তব্য মর্মে বলেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ (النساء: ٥٩)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর। নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মাঝে যারা বিচারক তাদের। তারপর যদি তোমাদের কোন বিষয়ে মত পার্থক্যে পতিত হও তবে তা আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে প্রত্যার্পন কর। যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হও। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম। (সূরা নিসাঃ৫৯)

তারপর বর্ণনা করেন যে, যারা আল্লাহ প্রদত্ব বিধান অনুযায়ী বিচার মীমাংসা চায় না, তাদের মধ্যে ঈমান থাকতে পারে না। একারণেই আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا﴾ (النساء: ٦٠)

এবং আপনি কি তাদেরক দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, আমরা সে বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তারা বিরুধীয় বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথ ভ্রষ্ট করে দিতে চায়। (সূরা নিসাঃ৬০)

আল্লাহ তায়ালার এ বাণী পর্যন্ত লক্ষণীয়ঃ

﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ (النساء:٦٥)

অতএব, তোমার প্রতিপালকের কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক বলে মেনে না নেয়। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম

সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবূল করে নিবে। (সূরা নিসাঃ৬৫)

উক্ত আয়াতে যারা রাসূলের কাছে বিচার কার্য্য নিয়ে যায়নি ও তার বিচারে সন্তুষ্ট হয়নি এবং তাকে বিচারক হিসেবে মেনে নিতে পারেনি, পবিত্র আল্লাহ কসম দ্বারা তাকীদ করে, সেই ব্যক্তির ঈমান নেই বলে ঘোষনা দিয়েছেন। যেমন তিনি শাসক গোষ্ঠিকে কাফির, জালিম, ফাসিক বলে আখ্যায়িত করেছেন, যারা তার বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না। এই মর্মে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়েছেনঃ

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (المائدة: ٤٤)

অর্থাৎ যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফির। (সূরা মায়েদাহঃ ৪৪)

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (المائدة: ٤٥)

অর্থাৎ যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই জালিম (সূরা মায়িদাহঃ৪৫)

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون ﴾ (المائدة: ٤٧)

অর্থাৎ যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই পাপাচারী। (সূরা মায়িদাহঃ৪৭)

অতএব আল্লাহ প্রদত্ব বিধান মেনে চলা অপরিহার্য এবং উলামাদের মধ্যে ইজতেহাদী মতবিরোধের সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ব বিধানের কাছে নিয়ে যাওয়া আবশ্যক। সুতরাং কোরআন ও সুন্নাহ ব্যতীত কোন মত বা কারো ফতোওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। হয় কোন মাযহাবের পক্ষ অবলম্বন করা হোক বা কোন নির্দিষ্ট ইমামের মত হোক এবং অভিযোগ ও সমস্ত অধিকারের ব্যাপারে বিবাদ বিসম্বাদে কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক ফয়সালা হওয়া আবশ্যক। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ব্যাপারে ইসলামের ফয়সালা মেনে চলতে হবে তা নয়। যেমন কোন দেশে ব্যক্তিগত ভাবে ইসলাম পালন করে এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে। কেননা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা পরিপূর্ণ আংশিক নয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ﴾ (البقرة:٢٠٨)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ তোমরা ইসলামে পুরোপুরীভাবে প্রবেশ কর। (সূরা বাকারাঃ২০৮)

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾ (البقرة: ٨٥)

অর্থাৎ তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশের প্রতি ঈমান আনবে আর কিছূ কিছূ অংশের প্রতি কুফরী করবে? (সূরা বাকারাঃ৮৫)

অনুরূপভাবে সকল মাযহাবের অনুসারীদের কর্তব্য হল তাদের ইমামদের মতামতসমূহকে কোরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। সার কথা হল: তাদের কথাগুলি যদি এতদ উভয়ের সাথে মিলে যায়, তবে গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি না মিলে তবে কোন পক্ষপাতিত্ব না করে অথবা কোন ব্যক্তি বিশেষের কথাকে প্রাধান্য না দিয়ে কোরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। বিশেষ করে আক্বীদা বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বেশী গুরুত্ব দেয়া ওয়াজিব হবে। কেননা সকল ইমামগণ (আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন) ঐ ব্যাপারে উপদেশ দিতেন। আর ইহাই ছিল তাদের সকলের মাযহাব। সুতরাং যে ব্যক্তি উহার বিরোধীতা করবে, সে ব্যক্তি তাদের অনুসারী নয়। যদিও সে নিজেকে তাঁদের সাথে সম্পৃক্ত মনে করুক। সে ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াতে বলেছেনঃ

﴿ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﴾

(التوبة: ٣١)

অর্থাৎ তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদেরকে তাদের পালনকর্তা হিসেবে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। (সূরা তওবাঃ৩১)

এ আয়াতটি খ্রিষ্টানদের জন্য নির্দিষ্ট নয়। বরং তাদের কর্মের মত যারা কর্ম করবে সকলেই ইহার অন্তর্ভুক্ত। অতএব

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের বিরোধীতা করল, এভাবে যে আল্লাহ প্রদত্ব বিধানকে বাদ দিয়ে মানব রচিত আইন মানুষের মধ্যে চালু করল অথবা তার প্রবৃত্তির চাহিদানুযায়ী ও নিজে যা চায়, তাহলে সে ইসলামের রশী ও ঈমানের রশীকে তার গলদেশ থেকে খুলে ফেলল। যদিও সে ধারণা করে যে সে মুমিন। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাদের এ ধরনের ইচ্ছাকে অস্বীকার করেছেন এবং ঈমান থাকার ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। যেহেতু يزعمون ইয়াযউমুন শব্দের আওতায় তাদের ঈমান না থাকা প্রমাণ হয়। কেননা يزعمون শব্দটি অধিকাংশ ঐ দাবীর ক্ষেত্রে বলা হয় যে দাবীতে সে উহার বিরোধী এবং উহার চাহিদা মুতাবিক আমল না থাকার কারণে সে মিথ্যাবাদী। এ কথাটির ব্যাখ্যা আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয়ঃ

﴿ وَقَدْ أُمِرُوٓاْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ ﴾ (النساء: ٦٠)

অর্থাৎ তাদেরকে উহার কুফরী করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (সূরা নিসাঃ৬০) কেননা তাগুতের (শয়তান) প্রতি কুফরী করা তাওহীদের একটি রুকন ও শর্ত। যেমন বাকারার একটি আয়াতে বর্ণিত আছে যতক্ষণ এ রুকনটি অর্জিত না হবে ততক্ষন সে একত্ববাদী হিসেবে গণ্য হতে পারে না। যেহেতু তাওহীদ বা একত্ববাদ হলো ঈমানের মূল ভিত্তি। যার কারণে সমস্ত আমল সঠিক হয় এবং উহার অনুপস্থিতিতে

সমস্ত আমলই নষ্ট- বরবাদ হয়ে যায়। যেমন ঐ মর্মে আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত বানীতে স্পষ্ট ঘোষণা দেনঃ

﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾ (البقرة: ٢٥٦)

অর্থাৎ যারা গুমরাকারী তাগুতদেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল। (বাকারাঃ২৫৬)

উহার স্বরূপ এই যে তাগুতের কাছে বিচার- ফয়সালা নিয়ে যাওয়ার অর্থই হলো তার প্রতি ঈমান আনা।

যারা আল্লাহ প্রদত্ব বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা ও দেশ পরিচালনা করে না, তাদের মাঝে ঈমান নেই। এ বাক্যটি দ্বারা এই ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে আল্লাহ প্রদত্ব বিধান অনুযায়ী সবকিছু পরিচালনা করাই ঈমান, আক্বীদাহ ও আল্লাহর ইবাদত। যার অনুগত হওয়া মুসলিমদের কর্তব্য। সুতরাং সে আল্লাহর শরীয়তকে এই হিসেবে মানবে না যে, তার বিধান মানুষের জন্য বেশী উপযুক্ত এবং নিরাপত্তার জন্য বেশী সঠিক। অথচ কিছু কিছু লোক এই দিকটাকে প্রাধান্য দেয় আর প্রথম দিকটাকে ভুলে যায়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত মনে না করে, নিজের নফসের জন্য কল্যাণকর মনে করে আল্লাহর বিধানকে মেনে নেয়, পবিত্র আল্লাহ তার দোষ বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ
وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴾ (النور: ٤٨-٤٩)

অর্থাৎ তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে আহবান করা হয়। তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। অধিকার তাদের স্বপক্ষে হলে তারা বিনীত ভাবে রাসূলের কাছে ছুটে আসে। (সূরা নূর ঃ৪৮-৪৯)

অতএব তাদের প্রবৃত্তি যা চায় তার উপরই তারা একমাত্র গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আর তাদের প্রবৃত্তির যা বিরোধী হয়, উহা হতে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। কেননা তারা রাসূলের ﷺ ফায়সালা মানার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করে না।

আল্লাহ প্রদত্ব বিধান ব্যতীত ফয়সালাকারীর হুকুম:

মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (المائدة: ٤٤)

অর্থাৎ যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই কাফির। (সূরা আল মায়িদাহ:৪৪)

এই আয়াত দ্বারা ইহাই প্রমাণ হচ্ছে যে আল্লাহ প্রদত্ব বিধান ব্যতীত বিচার ফয়সালা করা কুফরী। আর এ কুফরী হয় কখনও কুফরে আকবার বা বড় কুফর, যা ইসলামী মিল্লাত

থেকে বের করে দেয়। আবার কখনও কুফরে আসগার হয়, যা ইসলামী মিল্লাত থেকে বের করে না। আর উহা বিচারকের অবস্থা ভেদে: যদি সে এমন বিশ্বাস রাখে যে আল্লাহর দেয়া আইন অনুযায়ী ফায়সালা করা ও দেশ পরিচালনা করা ওয়াজীব নয়। এ বিষয়ে তার এখতিয়ার রয়েছে। অথবা আল্লাহর ফয়সালাকে তুচ্ছ মনে করে। আর এমন বিশ্বাস করে যে তার বিধান ছাড়া অন্যান্য আইন কানুন ও মানব রচিত নিয়মনীতি ঐ বিধান চাইতে উত্তম এবং উহা বর্তমান যুগের জন্য প্রযোজ্য নয়। অথবা আল্লাহ প্রদত্ব বিধান ব্যতীত বিচার ফয়সালা দ্বারা সে কাফির ও মুনাফিকদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়, তবে সে বড় কাফির। আর যদি সে এরূপ বিশ্বাস রাখে যে আল্লাহর আইন মুতাবিক ফয়সালা করা ওয়াজিব এবং সে তা বাস্তবরূপে জানল এবং সে উহা হতে অন্য পথ অবলম্বন করল। স্বীকার করা সত্বেও যে, সে শাস্তির যুগ্য, তবে সে পাপী এবং তাকে ছোট কুফরকারী হিসেবে গণ্য করা হবে। আর যদি ফয়সালা জানার ব্যাপারে তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ব্যয় করা সত্বেও আল্লাহর ফয়সালা জানতে অজানা রয়ে যায় এবং তাতে ভুল করে তবে সে বিচার ফয়সালায় ভুলকারী হিসেবে গণ্য হবে। তার প্রচেষ্টার কারণে এতে প্রতিদান রয়েছে এবং তার ভুল মার্জনীয়। (শরহুত তাহবিয়াহ পৃঃ ৩৬৩-৩৬৪)

আর এটা ব্যক্তিগত বিচার মীমাংশায়। কিন্তু যদি সমষ্টিগত বিচার মীমাংশা হয়, তাতে মতবিরোধ রয়েছে।ঃ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإن الحاكم إذا كان دينا لكن حكم بغير علم كان من أهل النار – وإن كان عالمًا لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار وإذا حكم بلا عدل ولا علم أولى أن يكون من أهل النار وهذا إذا حكم في قضية لشخص وأما إذا حكم حكماً عاماً في دين المسلمين فجعل الحق باطلاً والباطل حقاً والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكراً والمنكر معروفاً وهى عما أمر الله به ورسوله وأمر بما هى الله عنه ورسوله فهذا لون أخر يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم الدين الذي له الحمد في الأولى والآخرة.

অর্থাৎ শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহ) বলেনঃ নিশ্চয় হাকিম যদি ধার্মিক হয়, কিন্তু বিচার করল না জেনে, তবে সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি সে আলিম হয়, কিন্তু ফয়সালা করল সত্যের বিপরীত, সত্যকে জানা সত্বেও, সেও জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত।

আর যখন সে বেইনসাফী করে বা পক্ষপাতিত্ব করে এবং না জেনে ফয়সালা দিল, তবে তা জাহান্নামী হওয়া আরো যুক্তিসংগত। আর এ হুকুম তখনই হবে যখন সে কোন

ব্যক্তির বিচার ফয়সালা দিবে। পক্ষান্তরে যখন সে মুসলমানদের দ্বীনের মধ্যে সাধারণ বিষয়ে ফয়সালা দিবে, যাতে সে সত্যকে মিথ্যায় রূপান্তরিত করে ফেলে এবং মিথ্যাকে সত্যে রূপ দেয়, সুন্নাতকে বিদআত, বিদআতকে সুন্নাত, ভালকে মন্দ, মন্দকে ভালতে রূপ দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা করতে আদেশ করেছেন তা থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন তার আদেশ করে। তবে ইহার হুকুম হবে ভিন্ন রকম। যার ফয়সালা সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রভু নিজেই দিবেন। যিনি রাসূলগণের মা'বুদ। বিচার দিবসের মালিক। যার জন্য পূর্ব-পর সকল প্রশংসা।

لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (القصص: ٨٨)

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ (الفتح: ٢٨)

অর্থাৎ বিধান তারই এবং তোমরা তারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা কাসাসঃ ৮৮)

তিনিই তার রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন , যাতে একে অন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। সাক্ষ্যদাতা রূপে আল্লাহ যথেষ্ট । (সূরা আল ফাতহঃ২৮)

তিনি আরো বলেন এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি এ কথায় বিশ্বাস করে না যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুযায়ী ফয়সালা করা ওয়াজিব সে ব্যক্তি কাফির। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ব বিধানের অনুস্মরণ না করে, সে যা ভাল মনে করে তার দ্বারা মানুষের মধ্যে ফয়সালা করা যদি ন্যায় সঙ্গত মনে করে, তবে সে কাফির। সুতরাং এ থেকে বুঝা গেল যে, যে কোন জাতি তাদের সমস্যার ব্যাপারে যে কোন বিষয়ে ফয়সালা করুক না কেন, তা ইনসাফ ভিত্তিক করতে নির্দেশ দেয় সে কিন্তু জাতির ধর্মের মধ্যে আদল বা ইনসাফ হতে পারে, যা তাদের শীর্ষস্থানীয় ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা ন্যায় মনে করে প্রনয়ন করে। বরং ইসলামের দিকে সম্পৃক্তকারী অনেক ব্যক্তিবর্গ তাদের অভ্যাস অনুযায়ী তাদের পারস্পারিক সমস্যার ব্যাপারে এমন ফয়সালা করে থাকে, যা আল্লাহ তায়ালা অবতীর্ণ করেননি। যেমন পূর্বসূরী প্রত্যন্তবাসীদের প্রচলিত প্রথা (অর্থাৎ তাদের পূর্বসূরীদের অভ্যাসসমূহ) আর তারা ছিল অনুসৃত নেতৃবর্গ রাজা- বাদশাহ। তারা মনে করত যে কোরআন ও সুন্নাহ ব্যতীত ফয়সালাটাই যুক্তিযুক্ত এবং সঠিক। আর ইহাই হল কুফুরী। এমন অনেক লোক আছে যারা ইসলাম কবূল করে কিন্তু তারা প্রচলিত অভ্যাস মতই ফয়সালা দেয় যার আদেশ ঐ সমস্ত অনুস্মরনীয় ব্যক্তিরা দিয়ে

থাকে। তবে তারা যখন জানতে পারবে যে, একমাত্র আল্লাহ্ প্রদত্ব বিধান দ্বারাই ফয়সালা করা বৈধ। তখন তারা উহাকে আকড়ে ধরবে না। বরং তখন তারা আল্লাহ্ প্রদত্ব বিধানের বিপরীত বিধান দ্বারা ফয়সালা করে তারা কাফের। (মিনহাজুস্ সুন্নাহ আন্ নাবাবিয়্যাহ)

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম (রহ) বলেন: যাদের ব্যাপারে বলা হয় যে, এটা ছোট কুফরী যখন সে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের দিকে ফয়সালার জন্য যাবে, এরূপ বিশ্বাস থাকা সত্বেও যে, এ ব্যাপারে সে পাপকারী এবং আল্লাহর ফয়সালা একান্ত সত্য। আর এ কাজটি তার কাছ থেকে একবার বা অনুরূপ সংঘটিত হলে তবে তার এটা ছোট কুফরী হিসেবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি ধারাবাহিক ভাবে বিভিন্ন কানুন তৈরী করবে এবং তার শ্রেণী বিন্যাস করবে তবে সে কুফরী করবে, যদি ও তারা বলুক যে আমরা ভুল করছি এবং শরীয়তের বিধান অতীব ন্যায় ও সঠিক তবুও এটা কুফর হবে যা ইসলামী মিল্লাত থেকে বের করে দিবে। (ফাতাওয়া শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম আ-লুশ শায়খ ১২খণ্ড২৮০পৃঃ)

লেখক বলেন: শায়খ ইব্রাহীম (রহ:) حكم خاص বা আংশিক ফয়সালা যা বারবার আসে না, তার মাঝে এবং عام حكم বা সাধারণ ফয়সালা যা যাবতীয় আহকামে প্রযোজ্য হয়, অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তার মাঝে পার্থক্য

বর্ণনা করেছেন। আর সাব্যস্থ করেছেন যে, এ কুফরী সাধারণভাবে ইসলামী মিল্লাত হতে বহিষ্কারকারী। উহার একমাত্র কারণ হল, যে ব্যক্তি ইসলামী শরীয়তকে পরিত্যাগ করবে এবং মানবরচিত আইন কানুনকে তার বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করবে, তবে এটা প্রমাণ করল যে, সে মনে করে নিশ্চয় মানব রচিত আইন, ইসলামী শরীয়তের চেয়ে উত্তম ও উপযোগী। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা বড় কুফরী যা ইসলামী মিল্লাত থেকে বের করে দেয় এবং একত্ববাদকে নষ্ট করে দেয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শরীয়ত প্রণয়ন এবং হারাম ও হালাল নির্ধারণ করার অধিকার দাবী করাঃ

এমন বিধানসমূহ তৈরী করা যার উপর মানব গোষ্ঠি চলবে, তাদের ধর্মকর্ম, লেন-দেন আচার- আচরণ ও সমস্ত বিষয়, আর যা তাদের পারস্পারিক ঝগড়া বিবাদে এবং মামলা মুকাদ্দামায় সমাধান দেয়ার জন্য আইন প্রণয়নের অধিকার একমাত্র আল্লাহর। যিনি মানব মণ্ডলীর প্রতিপালক ও পরিচালক

এবং সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা।

﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (الأعراف: ٥٤)

অর্থাৎ তোমরা জেনে রাখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা আল্লাহ বরকতময়। যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক। (সূরা আ'রাফঃ৫৪)

তিনি সেই সত্বা যিনি তাঁর বান্দাদের জন্য যা উপযুগী মনে করেন তা তাদের জন্য প্রবর্তন করেন। তাদেরকে তার প্রভুত্বের হুকুম পালন কল্পে তাদের জন্য বিধান প্রণয়ন করবেন। আর তারা তাঁর দাসত্ব করার অনূকুলে বিধানসমূহকে গ্রহণ করে নিবে এবং এর কল্যাণ ও সুফল তারাই পাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ (النساء: ٥٩)

অর্থাৎ তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ব হয়ে পড় তাহলে আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি প্রত্যাবর্তন কর। যদি তোমরা আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিনতির দিক দিয়ে উত্তম। (সূরা নিসাঃ৫৯)

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي ﴾ (الشورى: ١٠)

অর্থাৎ তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর, তার ফয়সালা আল্লাহর কাছে সোপর্দ। ইনিই আমার পালনকর্তা আল্লাহ। (সূরা শূরাঃ১০)

এখানে পবিত্র আল্লাহ তাঁর বান্দা কর্তৃক তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে বিধান দাতা বানানো অস্বীকার করেন। তাই তিনি বিলেনঃ

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ﴾(الشورى:٢١)

অর্থাৎ তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য সে ধর্ম সিদ্ধ করেছে? যার অনুমতি আল্লাহ দেননি। (সূরা শূরাঃ২১)

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান ছাড়া, অন্যের বিধান বা শরীয়ত গ্রহণ করল, সে মহান আল্লাহর সাথে শরীক করল। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ যে সমস্ত ইবাদত প্রবর্তন করেননি, তাই বিদআত। আর প্রতিটি বিদআতই ভ্রষ্টতা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাদের ধর্মের মাঝে নতুন কিছু সৃষ্টি করল, যা এই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত। অপর একটি বর্ণনায় আছেঃ

(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল, যা আমাদের ধর্মের আমল অনুসারে নয় তা প্রত্যাখ্যাত। এ নব আবিষ্কার রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই হোক বা মানুষের মাঝে পারস্পারিক ফয়সালার ব্যাপারে হোক, যে বিধান আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ প্রবর্তন করেননি? তাই হল তাগুতী বিধান ও বর্বরতার বিধান।

﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ (المائدة: ٥٠)

অর্থাৎ তারা কি জাহিলিয়্যাত যুগের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহর অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে? (সূরা মায়েদাহঃ৫০)

অনুরূপ ভাবে হালাল হারাম নির্ধারণ করা, আল্লাহ তায়ালার হক বা অধিকার। এ ব্যাপারে তাঁর সাথে কারো অংশীদারিত্ব গ্রহণ করা বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ (الأنعام : ١٢١)

অর্থাৎ যে সব বস্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না। এ ভক্ষণ গুনাহ। নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্রত্যাদেশ করে। যেন তারা

তোমাদের সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে। (সূরা আনআমঃ১২১)

সুতরাং এখানে মহান আল্লাহ শয়তান ও তাদের সহচরদের আনুগত্য প্রকাশকে আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করার ব্যাপারে তার সাথে শরীক স্থাপন করা সাব্যস্থ করেছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহর হালালকৃত বস্তুকে হারাম করা অথবা আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হালাল গণ্য করার ব্যাপারে যারা আলেমদের ও আমীর উমারাদের আনুগত্য করে , তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ করল। এ বিষয়টাকে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে বলেছেনঃ

﴿ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

(التوبة: ٣١)

অর্থাৎ তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদেরকে তাদের পালনকর্তা রূপে গ্রহণ করেছে, আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের ইবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তারা যাকে তাঁর শরীক সাব্যস্থ করে তার থেকে তিনি পবিত্র। (সূরা তাওবাহঃ ৩১)

ইমাম তিরমিজী ও অন্যান্যের নিকট বর্ণিত আছেঃ

أن النبي ﷺ تلا هذه الأية على عدى بن حاتم الطائي رضي الله عنه فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم قال :أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى :قال النبي ﷺ فتلك عبادهم

অর্থাৎ নাবী কারীম ﷺ এ আয়াতটি হযরত আদী বিন হাতিম আততায়ী রাঃ এর সামনে তিলাওয়াত করলেন, তখন তিনি (আদী) বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমরা তো তাদের ইবাদত করি না। নাবী কারীম ﷺ উত্তরে বললেনঃ আল্লাহ যা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন, তারা কি সেগুলো তোমাদের জন্য হালাল বললে তোমরা কি তা হালাল জান না? আর যা আল্লাহ তায়ালা হালাল করেছেন তারা তা হারাম বললে তোমরা কি তা হারাম জান না? তিনি বললেন হ্যাঁ এ কথা সত্য। নাবী কারীম ﷺ তদুত্তরে বললেনঃ ইহাই তাদের ইবাদত করা ।(তিরমিজী, ইবনু জারীর ও অন্যান্য থেকে বর্ণিত)

অতএব আল্লাহ ব্যতীত হালাল ও হারাম করার ব্যাপারে তাদের আনুগত্য তাদের ইবাদত করা এবং তাদেরকে শরীক করা হয়। আর ইহা বড় শিরক যা তাওহীদের বিপরীত, যা কালিমা শাহাদাত لا إله إلا الله এর মূল। কেননা এই কালিমার দাবী হলো হালাল ও হারাম নির্ধারণ করা আল্লাহর অধিকার। আর এমন যদি হয় ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে, আনুগত্য করে উলামা ও আবেদদের হারাম

Contents

ও হালাল নির্ধারণ করার ব্যাপারে, যা আল্লাহর বিধানের বিপরীত হয় অথচ তারা এমতাবস্থায় জ্ঞান ও দ্বীনের নিকটতম। কখনও তাদের ইজতেহাদে ভুল হয়ে থাকে, সত্যে পৌছতে পারে না, তখন তারা এর উপর বিনিময় পাবার যোগ্য। তবে কেমন হবে ঐ ব্যক্তির যে, আনুগত্য করে মানব রচিত আইনের যা কাফির ও নাস্তিকদের তৈরী। যে মতবাদ আমদানী করছে মুসলমানদের দেশসমূহে এবং তদানুযায়ী তাদের মাঝে বিচার ফয়সালা করছে?

নিশ্চয় এ ব্যক্তি কাফিরদেরকে আল্লাহ ব্যতীত প্রভূ বানিয়ে নিয়েছে তারা তার

জন্য আইন ও বিধান রচনা করছে এবং তার জন্য তারা হারামকে বৈধ করছে আর মানুষের মাঝে এভাবে বিচার ফয়সালা করছে। لا حول ولا قوة إلا بالله

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কুফরী মতবাদসমূহ ও জাহিলিয়্যাতের দিকে আহবানকারী বিভিন্ন দলের সাথে সম্পৃক্ততার বিধানঃ

একঃ কুফরী মতবাদসমূহের সাথে সম্পৃক্ততা: যেমন নাস্তিকতাবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ, পূজিবাদ, আরো বিভিন্ন কুফরী মতবাদ দ্বীন ইসলাম থেকে বিচ্যুত। তবে যদি এ সকল মতবাদের সাথে সম্পৃক্তকারী ব্যক্তি ইসলামের দাবী করে,

তাহলে এটা হবে النفاق الأكبر বা বড় নিফাক। কেননা মুনাফিকরা বাহিরে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। পক্ষান্তরে গোপনে কাফিরদের সাথে সম্পর্ক রাখে। যেমন আল্লাহ তায়ালা তাদের মর্মে বলেছেন-

﴿ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ﴾ (البقرة :١٤)

অর্থাৎ আর তারা যখন ঈমানদার লোকদের সাথে মিশে, তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মাত্র। (সূরা বাকারা:১৪)

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

﴿ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (النساء :١٤١)

অর্থাৎ এরা এমন মুনাফিক যারা তোমাদের কল্যাণ অকল্যাণের প্রতীক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকে। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় তোমাদের যদি কোন বিজয় অর্জিত হয়, তবে তারা বলে আমরাও কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? পক্ষান্তরে কাফিরদের যদি আংশিক বিজয় হয়, তবে বলে আমরা কি

তোমাদের ঘিরে রাখিনি এবং মুসলমানদের কবল থেকে রক্ষা করিনি। (সূরা নিসাঃ ১৪১)

সুতরাং এই কপট (মুনাফিক) লোকেরা ধোকাবাজ: তাদের প্রত্যেকের দুটি চেহারা রয়েছে। তারা এক মুখে মুমিনদের সাথে সাক্ষাৎ করে আর অপর মুখ তাদের নাস্তিক ভাইদের দিকে ফিরিয়ে দেয়। আর তার দুটি জিহবাও আছে। এ দুটির প্রকাশ্যটির সাথে মুসলমানেরা সাক্ষাৎ করে, আর অপরটি তার গোপন তথ্যের অনুবাদ করে।

﴿ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ ﴾ (البقرة:١٤)

অর্থাৎ আর তারা যখন ঈমানদার লোকদের সাথে মিশে, তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মাত্র। (সূরা বাকারাঃ১৪)

তারা কোরআন ও সুন্নাহর ধারকদেরকে উপহাস ও তুচ্ছ করার ফলে ও দুটি থেকে বিমুখ হয়ে গেছে এবং তাদের কাছে যে জ্ঞান রয়েছে তাতে আনন্দিত হয়ে কোরআন ও সুন্নাহর বিধানের আনুগত্য করা থেকে অস্বীকৃতি জানায়। যে জ্ঞান তাদেরকে ক্ষতি এবং অহংকার ছাড়া আর কিছুই

উপকার করবে না। সুতরাং তাদেরকে সদা সর্বদা ঐশী বাণীকে উপহাস করতে দেখতে পাবে।

﴿ اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (البقرة :١٥)

অর্থাৎ আল্লাহই তাদের সাথে উপহাস করেন। তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন, যেন তারা নিজেদের অহংকার ও কুমতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে। (সূরা বাকারাঃ১৫)

অথচ আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন, মুমিনদের সংগে সম্পৃক্ত থাকার জন্য।

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (التوبة :١١٩)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদী লোকদের সাথে থাকো। (সূরা তাওবাহঃ ১১৯)

এই কুফরী মাযহাবসমূহ সীমালংঘনকারী। কেননা এগুলো বাতিলের উপর স্থাপিত। নাস্তিকতাবাদীরা পবিত্র সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এবং ঐশী ধর্মসমূহের বিরুধীতা করে। আর যে ব্যক্তি তার জ্ঞানে কোন বিশ্বাস ছাড়াই জীবন যাপন করতে সন্তুষ্ট থাকে এবং চিরন্তন সত্যকে অস্বীকার করে , সে তার জ্ঞানকেই বাতিল করে দিয়েছে।

অর্থ নিরপেক্ষবাদীরা সমস্ত দ্বীনকে অস্বীকার করে এবং তারা নির্ভর করে বস্তুবাদের উপর , যার কোন দিক

নির্দেশনা নেই এবং পশুত্ব জীবন ছাড়া এ জীবনের কোন লক্ষ্য উদ্দেশ্য নেই।

আর পুজিবাদীরা তাদের একমাত্র ইচ্ছা, যে পদ্ধতিতেই হোক অর্থ সঞ্চয় করা। হারাম- হালালে কোন ধরা বাধা নিয়ম নেই। ফকীর ও মিসকিনদের উপর কোন প্রকার দয়া ও সহানুভূতি নেই এবং তাদের অর্থ সঞ্চয়ের একমাত্র মাধ্যম সুদ, যেটা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের অর্থনৈতিক পদ্ধতির প্রতিদন্ধী। আর যা দেশ ও জাতি ধ্বংশকারী এবং দরিদ্র জনগোষ্টির রক্ত চোষণকারী। কে এমন জ্ঞানী রয়েছে যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমান রয়েছ। এসব মাযহাবের উপর জীবন যাপন করতে সন্তুষ্ট হবে, যাতে কোন জ্ঞান, দ্বীন-ধর্ম, তার জীবনের সঠিক উদ্দেশ্য নেই, যে দিকে সে লক্ষ্য করে চলবে এবং তার কারণে সংগ্রাম করবে। অধিকাংশ মুসলিম দেশে এসব মাযহাবসমূহ তখনই আক্রমন করেছে, যখন তাদের অধিকাংশ জনগোষ্ঠির নিকট থেকে সঠিক দ্বীন বিলুপ্ত হয়েছে এবং ধ্বংসের উপর লালিত হয়েছে। আর তারা জীবন যাপন করেছে একমাত্র অনুকরণের উপর।

দুই ঃ জাহিলিয়্যাত বা বর্বরতার দিকে আহবানকারী দলসমূহ ও জাতীয়তাবাদ ও বর্ণবাদ ইত্যাদীর সাথে সম্পৃক্ততা আরোও এক ধরণের কুফরী এবং দ্বীন ইসলাম থেকে বিচ্যুত হওয়া অথবা ত্যাগ করা। কেননা ইসলাম

স্বজনপ্রিতি অস্বীকার করে এবং জাহিলিয়্যাতের শ্লোগানকেও অসমর্থন করে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (الحجرات:١٣)

অর্থাৎ হে মানব! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেজগার। (সূরা হুজুরাতঃ১৩)

আর নাবী কারীম ﷺ বলেনঃ

(ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية و ليس منا من غضب لعصبية).

অর্থাৎ যে লোক বিদ্বেষাত্মক ভাব-ধারার দিকে লোকদের আহবান জানায়, যে লোক বিদ্বেষাত্মক ভাব-ধারার উপর লড়াই করে, যে লোক বিদ্বেষাত্মক ভাব-ধারার উপর রাগান্বিত হয়, তারা কেউই আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়। (মুসলিম)

وقال ﷺ(إن الله قد أذهب عنكم عصبية الجاهلية وفخرها بالأباء إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى).

আর তিনি আরো বলেন নিশ্চয় আল্লাহ্ জাহেলী যুগের স্বজনপ্রীতি ও জাহিলী যুগের পিতৃ গৌরবকে তোমাদের প্রতি রহিত করেছেন। সে কেবল পরহেজগার মুমিন হবে অথবা দুর্ভাগ্য পাপাচারী হবে। সমগ্র মানুষই আদম সন্তান আর আদম عليه السلام মাটি হতে সৃষ্ট। পরহেজগারীতা ছাড়া কোন অনারবের উপর আরবদের মর্যাদা নেই। (তিরমিজী এবং অন্যান্যের বর্ণনা)

আর এই দলাদলি মুসলমানদেরকে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত করে দেয়। অথচ আল্লাহ ন্যায় এবং তাকওয়ার উপর একতাবদ্ধ হতে এবং তাতে সাহায্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং আপশে মতভেধ করতে ও দলে দলে বিভক্ত হতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন

﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾(آل عمران: ١٠٣)

অর্থাৎ আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর, পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, তখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। (সূরা আলে ইমরানঃ ১০৩)

পবিত্র আল্লাহ তায়ালা চান আমাদের যেন একটিই মাত্র দল হয়, তারাই হবে আল্লাহর একমাত্র মুক্তিপ্রাপ্ত দল। কিন্তু ইসলামী বিশ্ব ইউরোপের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের পর থেকে আত্মীয় পক্ষপাতিত্ব , জাতীয়তাবাদ এবং স্বদেশ প্রিয় দলসমূহের আনুগত্য করছে। আর তাদের কথায় বিশ্বাস করছে যেন তা এমন বাস্তব জ্ঞান সঞ্চয়ের বিষয়, সিলেবাস নির্ধারিত যা থেকে বাচার কোন বিকল্প নেই। আর তার জনগণ এই জাতীয়তাবাদকে জাগরুক করার পিছনে দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে, ইসলাম যার কবর রচনা করেছিল। এবং জাতীয়তাবাদের গান গায় ও তার নির্দেশসমূহকে জীবিত করে আর তার সময়কালকে নিয়ে গর্ব করে যা ইসলামের পূর্বে অতিক্রম করেছে বা কেবল ইহাকেই ইসলাম বারংবার বর্বর বলে আখ্যা দিয়েছে।

পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে এ থেকে বের হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে এ নিয়ামতের শুকরিয়া করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন।

মুমিনের স্বভাব হবে জাহিলিয়্যাতের দিকে ফিরে না যাওয়া, যার যুগ পেরিয়ে গেছে। স্বভাবতঃ মুমিন ব্যক্তি ঐ জাহেলী যুগকে স্মরণ করলে অপছন্দ করবে এবং রাগান্বিত হবে ও শরীরের লোমহর্ষ শুরু হবে। যেমন তার উদাহরণঃ জেলের একজন শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি জেল থেকে মুক্তি প্রাপ্তির

দিনগুলোকে বন্দী হবার দিনের কথা ও তার বন্দীবশায় শাস্তি পাওয়ার এবং লাঞ্ছিত হওয়ার কথা স্মরণ করে বিদ্বেষে তার অঙ্গ কেঁপে উঠে। অন্য এক ব্যক্তি দীর্ঘ দিন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল, সে তার সুস্থাবস্থায় রোগাক্রান্ত হওয়ার দিনগুলো স্মরণ করলে তার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায় এবং তার চেহারার রং বদলিয়ে যায়। (রিসালাহ "যে ধর্মচ্যুতির কোন আবু বকর নেই" আবুল হাসান আননাদাবী রচিত)

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এ সমস্ত বিভিন্ন দলে বিভক্তি (ও হানাহানি) আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি, যারা আল্লাহ প্রদত্ব শরীয়ত বা বিধানকে উপেক্ষা করেছে এবং তার দ্বীনকে অস্বীকার করেছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ (الأنعام: ٦٥)

অর্থাৎ আপনি বলুন, তিনিই শক্তিমান যে, তোমাদের উপর কোন শাস্তি উপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে প্রেরণ করবেন অথবা তোমাদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে সবাইকে মুখোমোখি করে দিবেন এবং একে অন্যের উপর আক্রমণের স্বাদ আস্বাদন করাবেন। (সূরা আনআমঃ ৬৫)

আর নাবী কারীম ﷺ বলেছেনঃ

(وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم)

অর্থাৎ তাদের ইমামগণ আল্লাহর কিতাব দ্বারা ফয়সালা না করলে, আল্লাহ তাদের শাস্তি তাদের মাঝে স্থির করে দেন। (ইবনে মাজাহ)

নিশ্চয় বিভিন্ন দলের পক্ষ- পাতিত্ব করা অন্যান্যদের কাছে যে হক্ক বা সত্য রয়েছে তাকে অস্বীকার করার কারণ হয়ে দাড়ায়। যেমন ইয়াহুদীদের বাস্তব অবস্থার কথা আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرونَ بِمَا وَرَاءهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَهُمْ ﴾ (البقرة: ٩١)

অর্থাৎ যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা পাঠিয়েছেন তা মেনে নাও তখন তারা বলে, আমারা মানি যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। সেটি ছাড়া সবগুলোকে তারা অস্বীকার করে অথচ এ গ্রন্থটি সত্য এবং সত্যায়ন করে ঐ গ্রন্থের যা তাদের কাছে রয়েছে। (সূরা বাকারাঃ৯১)

আর যেমন বর্বর লোকদের ব্যাপারে ঘটেছিল যারা ঐ সত্যকে পরিত্যাগ করেছিল যা সহ রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করেছিলেন। এটাকে তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের মতাদর্শের পক্ষপাতিত্ব করে প্রত্যাক্ষান করেছিল।

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا ﴾

(البقرة: ١٧٠

অর্থাৎ আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে হুকুমেরই আনুগত্য কর, যা আল্লাহ তায়ালা নাজিল করেছেন, তখন তারা বলে কখনও না, আমরা তো সে বিষয়েরই অনুস্মরণ করব, যাতে আমরা আমাদের বাপ- দাদাদেরকে দেখেছি। (সূরা বাকারাঃ১৭০)

এ সমস্ত বিভিন্ন দলের লোকেরা তাদের পূর্ব যুগের লোকদের মতাদর্শকে ইসলামের বিকল্প হিসেবে নির্ধারণ করতে চায়, যা অনুগ্রহ পূর্বক আল্লাহ তায়ালা সকল জনমানবের কল্যাণার্থে দান করেছেন।

নবম পরিচ্ছেদ

জীবনের জন্য বস্তুবাদী চিন্তাধারা এবং এর ক্ষতিকর দিকসমূহঃ

তথায় জীবনের জন্য দুটি চিন্তাধারা রয়েছে। একটি বস্তুবাদী চিন্তা আর অপরটি সঠিক এবং এই প্রতিটি চিন্তা গবেষনার প্রভাব রয়েছেঃ

(ক) জীবন যাপনের জন্য বস্তুবাদী চিন্তা এর অর্থঃ মানুষের চিন্তা গবেষণা তার পার্থিব জীবনের যাবতীয় সাচ্ছন্দ অর্জন

করার মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়া এবং তার কাজ কর্মে উহার গণ্ডির মধ্যে হওয়া, তাই তার চিন্তা গবেষণা উহার পরিনতি কি তা উপলব্ধি করে তার জন্য কোন কাজ করে না, ও তার কাজের কোন গুরুত্ব দেয় না এবং সে জানতে চায় না যে নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এ দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের জন্য ক্ষেত্রভূমি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি দুনিয়াকে কর্মস্থল হিসেবে বানিয়েছেন ও আখেরাতকে প্রতিফল প্রাপ্তির স্থান হিসেবে নির্ধারণ করে রেখেছেন।

সুতরাং যে ব্যক্তি তার দুনিয়ার জীবনে সৎকর্ম দ্বারা শষ্য ফলাবে, সে উভয় জগতে লাভবান হবে। আর যে ব্যক্তি তার দুনিয়ার জীবনকে নষ্ট করবে, তার আখেরাতও নষ্ট হবে।

﴿ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ (الحج: ١١)

অর্থাৎ সে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থ। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি। (সূরা হজ্জঃ১১)

আল্লাহ এ দুনিয়াকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি। বরং ইহা বিরাট বিরাট হিকমতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴾ (الملك: ٢)

অর্থাৎ যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ। সূরা মূলকঃ২)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেনঃ

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾

(الكهف: ٧)

অর্থাৎ আমি পৃথিবীর সব কিছুকে পৃথিবীর জন্যে শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে অপেক্ষাকৃত ভাল কাজ করে। (সূরা কাহাফঃ ৭)

পবিত্র আল্লাহ এ দুনিয়ার পার্থিব ভোগ্য সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন। যেমন প্রকাশ্য সৌন্দর্য, অর্থ সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ঐশ্বর্য্য, রাজত্ব এবং যাবতীয় ভোগ বিলাসের সামগ্রী যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না।

সুতরাং মানুষের মাঝে এমন অনেক লোক আছে তারাই সংখ্যা গরিষ্ট যারা তাদের দৃষ্টিকে বাহ্যিক সম্পদ ও তার ছলনার উপর সীমাবদ্ধ রেখেছে এবং সেগুলো উপভোগ করছে এবং গোপন রহস্যের দিকে লক্ষ করছে না। অতঃপর তারা তা সঞ্চয় ও সংরক্ষণে ও উপভোগে ব্যস্ত হচ্ছে পরকালের কর্তব্যকে ভুলে। বরং সেখানে যে আরেকটি জীবন আছে, তাকে অস্বীকার করছে । যেমন আল্লাহ তায়ালা এই মর্মে বলেছেনঃ

﴿وَقَالُواْ إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ (الأنعام: ٢٩)

অর্থাৎ তারা বলে যে, আমাদের এ জীবনত কেবল পার্থিব জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত হতে হবে না। (সূরা আনআমঃ ২৯)

আল্লাহ তায়ালা জীবন সম্পর্কে এ ধরণের চিন্তা ভাবনা করার জন্য শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। তাই তিনি বলেছেনঃ

﴿ إِنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُواْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمُ النُّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾(يونس: ٧-٨)

অর্থাৎ অবশ্যই যেসব লোক আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই উৎফুল্ল হয়েছে, তাতেই প্রশান্তি অনুভব করেছে এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে বেখবর এসব লোকদের ঠিকানা হল আগুন। সে সবের বদলা হিসেবে যা তারা অর্জন করেছিল। (সূরা ইউনুসঃ৭-৮)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেনঃ

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ (هود: ١٥-١٦)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, হয় আমি তাদের দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছু কমতি করা হবে না। এরাই হল সে সব লোক, আখেরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছুই নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল, সবই বরবাদ করেছে আর যা উপার্জন করেছিল সবই বিনষ্ট হল। (সূরা হুদঃ ১৫-১৬)

এই শাস্তির হুশিয়ারী ঐ সকল চিন্তাধারা পোষণকারী লোকদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে, যারা আখেরাতের আমল করে তার বিনিময়ে দুনিয়া অর্জন করতে চায়। যেমন মুনাফিকরা ও লোক দেখানো আমলকারীরা, যারা তাদের আমলের দ্বারা পার্থিব সুখ সাচ্ছন্দ অর্জন করতে ইচ্ছুক। অথবা পুনরুত্থান ও বিচার দিবসকে অবিশ্বাসী কাফিররা। যেমন ইসলাম পূর্ব বর্বর লোকদের অবস্থা ছিল। পুজিবাদী, সাম্যবাদী এবং ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী- নাস্তিকতাবাদী ধ্বংসাত্মক দলসমূহের পূর্বপর হাল হাকীকত। আর ঐ সকল লোকেরাই তাদের জীবনের মূল্য বুঝেনা এবং তাদের চিন্তাধারা যে পশুর চিন্তা চেতনার সমতুল্য বরং তার চেয়েও অধম ও জঘন্ন একথা তারা মনে করেনা। কারণ তারা তাদের চিন্তাশক্তিকে অকেজ করে দিয়েছে এবং তাদের শক্তি সামর্থকে এমন কাজের পিছনে ব্যায় করে ও তাদের অমূল্য সময়গুলোকে এমন ক্ষণস্থায়ী

অসার জিনিসের পিছনে নষ্ট করে যা তাদের ভোগবিলাসের জন্য স্থায়ী নয় এবং তারাও সেসব জিনিস উপভোগ করার জন্য চিরস্থায়ী হয়ে থাকতে পারবেনা। আর তারা তাদের গন্তব্যস্থানের জন্য কিছুই করেনা- যে গন্তব্যস্থান তাদের আগমন অপেক্ষা করছে এবং সেখানে তাদের জন্য সর্ব প্রকারের সুখ, সর্ব প্রকারের কল্যাণ ও অনন্তসীমার ভোগের সামগ্রী প্রস্তুত রয়েছে।

পক্ষান্তরে চতুষ্পদজন্তু ঐ লোকদের বিপরীত। যেহেতু তাদের জন্য কোন অপেক্ষমান ভবিষ্যত ঠিকানা নেই এবং তাদের জ্ঞানও নেই যে তারা তাদের ভবিষ্যত জীবন নিয়ে এবং সেই জীবনের সুখ-শান্তি নিয়ে চিন্তা গবেষণা করবে।

আর এই জন্য আল্লাহ তায়ালা তাদের মর্মে বলতেছেনঃ

﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (الفرقان: ٤٤)

অর্থাৎ আপনি কি মনে করনে যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বুঝে তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মত। বরং আরও পথ ভ্রান্ত। (সূরা ফুরক্বান:৪৪)

মহান আল্লাহ এ সকল চিন্তা ভাবনাকারীদেরকে জ্ঞানহীন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ (الروم: ٦-٧)

অর্থাৎ কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক জানে এবং তারা পরকালের খবর রাখে না। (সূরা রূম ঃ ৬-৭)

তারা নিত্য নতুন আবিষ্কার , কারিগরির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন থাকা সত্ত্বেও চরম মুর্খ। জ্ঞানী হিসেবে গণ্য হবার অধীকারী নয়। কেননা তাদের জ্ঞান দুনিয়ার চাকচিক্যকে অতিক্রম করেনি। আর এটা অসম্পুর্ণ জ্ঞান। তাদের মর্মে এই সুন্দর সুনামটি সম্পৃক্ত করা যায় না। তাই বলা হয়ঃ জ্ঞানীগণ উপাধীটি একমাত্র তাঁদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, যারা আল্লাহকে চিনে এবং তাঁকে ভয় করে । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ (فاطر: ٢٨)

অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাদের মাঝে কেবল আলেমরাই আল্লাহকে ভয় করে। (সূরা ফাতিরঃ২৮)

পার্থিব জীবনের জন্য বস্তু চিন্তার অংশ হিসেবে কারুনের ঘটনা এবং তাকে যা ধন সম্পদ আল্লাহ তায়ালা দিয়েছিলেন, তা বর্ণনা করা যায়ঃ

﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ (القصص:٧٩)

অর্থাৎ কারুন জাকজমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত, তারা বলল হায়, কারুন যা প্রাপ্ত হয়েছে আমাদেরকে যদি তা দেয়া হত। নিশ্চয় সে বড় ভাগ্যবান। (সূরা কাসাসঃ৭৯)

তারাও তার (কারুন) মত পাওয়ার জন্য কামনা ও আকাংখা করেছিল আর তাদের পার্থিব দৃষ্টি ভংগীর উপর ভিত্তি করে ভাগ্যবান হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল। ইহা তেমনিই ছিল যেমন বর্তমান অবস্থায় কাফির রাষ্ট্রসমূহে ঘটতেছে এবং তাদের নিকট অর্থনৈতিক ও কারিগরীকে দিক দিয়ে অগ্রগতি হচ্ছে। সে ব্যাপারে মুসলমানদের মাঝে দুর্বল ঈমানের লোকেরা তাদের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকছে। কিন্তু তারা যে কুফরীর উপর অবস্থান করছে। ইহার পরিনতি যে ভয়াবহ সে দিকে মোটেও ভ্রুক্ষেপ করছে না। ফলে তাদের অন্তরের এই ভুল দৃষ্টিভঙ্গী তাদেরকে কাফিরদের সম্মান ও মর্যাদা করার দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং তাদের দুঃচরিত্র ও খারাপ অভ্যাসে অভ্যস্ত হচ্ছে। কিন্তু তারা প্রচেষ্টায় ও শক্তি সঞ্চয়ে এবং আবিষ্কার ও কারিগরীর মত উপকারী বস্তুসমূহে তাদের (কাফিরদের) অনুকরণ করছে না।

(খ) জীবন যাপনের জন্য দ্বিতীয় চিন্তা ধারাঃ

(সঠিক চিন্তাধারা): তা হল এ জীবনে যে ধন-সম্পদ, রাজত্ব, আর্থিক শক্তি আছে। তা মানুষের উপদেশ গ্রহণ করার মাধ্যম। যার দ্বারা পরকালের জন্য আমল করার সাহায্য পায়। সুতরাং দুনিয়া বাস্তব দিক থেকে খারাপ নয়। একমাত্র দুনিয়াতে বান্দার কাজের উপর ভিত্তি করে ভাল-মন্দ বলা হয়। অতএব ইহা (দুনিয়া) আখেরাতে পাওয়ার জন্য পারাপারের সেতুবন্ধন, ও সেখান থেকেই পাওয়া যায় জান্নাতের পাথেয়। আর জান্নাত কামীরা এ দুনিয়াতে যা সৎকর্মের চাষ করে থাকে, একমাত্র তার বিনিময়ে পরকালের সুখের জীবন অর্জন করে থাকে। তাই এ দুনিয়া হল আল্লাহর পথে জিহাদ করা, নামায প্রতিষ্ঠা করা, সিয়াম সাধনা করা, আল্লাহর পথে ব্যয় করা এবং গোপনীয়তার সাথে প্রতিযোগীতা করে বিভিন্ন কল্যাণের কাজ করা।

আল্লাহ তায়ালা জান্নাত বাসীদের শুভ সংবাদ দিয়ে বলেনঃ

﴿كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية ﴾ (الحاقة: ٢٤) يعني الدنيا

অর্থাৎ তোমরা বিগত দিনসমূহে যা প্রেরণ করেছিলে তার প্রতিদানে খাও ও পান কর তৃপ্তি সহকারে। (সূরা হাক্কাহঃ ২৪)

দশম পরিচ্ছেদ: ঝাড়-ফুক ও তাবিজ-কবজ

رقي রুক্বা শব্দটি বহু বচন رقية রক্বিইয়াহ'র। তা হচ্ছে এমন সব দৃঢ় সংকল্প বিজড়িত শব্দ সমষ্টি যা রোগীর উপর পাঠ করা হয়। যেমন জ্বর ও মির্গী এবং আরো অন্যান্য রোগ। আর ইহাকে عزائم আযাইম নামে অভিহিত করা হয়। আর ইহা (ঝাড়-ফুক) দুভাগে বিভক্ত।

প্রথম ভাগঃ যার ভিতর শিরকের লেশ মাত্র থাকে না। তা এমন যে রোগীর উপর কোরআনের কিছু অংশ পাঠ করা হয়, কিংবা আল্লাহর নামসমূহ ও গুনাবলীসহ মুক্তি চাওয়া হয়। ইহা বৈধ এজন্য যে, নাবী ﷺ ঝাড়ফুক দিয়েছেন ও তিনি ঝাড়ফুক সমর্থন করেছেন।

عن عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؛ فقال؛ أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى مالم تكن شركاً.

অর্থাৎ আওফ বিন মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আমরা জাহিলিয়্যাতের যুগে ঝাড়-ফুক করতাম, তখন আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল ﷺ এ ব্যাপারে আপনার কি অভিমত? তদুত্তরে তিনি ﷺ বললেন তোমরা আমার নিকট তোমাদের ঝাড়ফুকের কালামগুলি পেশ কর। শিরক না হলে তো ঝাড়ফুকে কোন দোষ নেই। (মুসলিম)

আল্লামা সূয়ূতী (রহ) বলেন, যে তিনটি শর্ত সাপেক্ষে ঝাড়ফুক বৈধ হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণ একমত পোষন করেছেন শর্তগুলো নিম্নরূপঃ

১। কোরআন, আল্লাহর নাম ও গুনাবলীসমূহ দ্বারা হতে হবে।

২। আরবী ভাষায় হতে হবে এবং যার অর্থ বুঝা যায়।

৩। এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে ঝাড় ফুকের নিজস্ব কোন প্রভাব নেই। আরোগ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। (ফাতহুল মাজিদ ১৩৫পৃষ্ঠা)

ঝাড় ফুকের পদ্ধতি এই যে, রোগীর উপর কিছু পড়ে ঝাড় ফুক দেয়া। অথবা কিছু পড়ে পানিতে ফুক দেয়া ও অসুস্থ ব্যক্তিকে তা পান করানো। যেমন সাবিত বিন ক্বায়েসের হাদীসে বর্ণিত আছেঃ

أن النبي ﷺ أخذ تراباً من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه.

অর্থাৎ নাবী কারীম ﷺ বুতহান নামক স্থান থেকে মাটি নিয়ে আসেন। অতঃপর তিনি তা একটি বড় পিয়ালায় রাখেন, তারপর তিনি তাতে ফুঁক দেন এবং তিনি তা তার (শরীরের) উপর ঢেলে দিলেন। (আবু দাউদ)

দ্বিতীয় ভাগঃ যা শিরক মুক্ত নয়। যেমন তার মাধ্যমে গাইরুল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা, উদ্ধার প্রার্থনা করা ও আশ্রায় প্রার্থনা করা। যথাঃ জ্বিনদের, ফিরিস্তাগণের,

অর্থাৎ ঝাড়ফুক, তাবিজ কবজ এবং ভালবাসা সৃষ্টির তাবিজ ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে শিরক। (আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ এবং হাকিম)

تولة কে (এমন জিনিস (কবজ) হিসেবে ধারণ করা হয় যা দ্বারা স্ত্রীর অন্তরে স্বামীর ভালবাসা, আর স্বামীর অন্তরে স্ত্রীর ভালবাসার উদ্রেক হয়।

এই মতটি তিনটি কারণেঃ বিশুদ্ধঃ

একঃ এই উদ্ধৃত দলীলটিতে নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে ব্যাপকতা বিদ্যমান এবং এর বিপরীত কোন দলীল আসেনি।

দুইঃ অবৈধ তাবিজ চালু হওয়ার পথ বন্ধ করা । কেননা, যদি কোরআন দ্বারা তাবিজ কবজ ঝুলানোর অনুমতি দেয়া হয় তবে এর ফলে কোরআন ছাড়াও অবৈধ তাবিজের প্রচলন ঘটবে।

তিনঃ কোরআন দ্বারা তাবিজ ভরে ঝুলানো হলে কোরআনকে অবমাননা ও কোরআন নিয়ে খেল তামাশা করা হয়। কারণ এতে করে তাবিজ ধারণকারী ব্যক্তি পায়খানা প্রশ্রাব করার সময় ময়লা, নুংরা ও অপবিত্র স্থানে নিয়ে যায়, যে সকল স্থান থেকে কোরআনকে পবিত্র রাখা অপরিহার্য্য। (ফাত্হুল মাজিদ ১৩৬পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় প্রকার তাবিজ কবজঃ এমন তাবিজ কবজ মানুষের কোন কোন অংগে ঝুলানো হয়, যাতে কোরআনের কোন লেশ থাকে না। যেমন দানা জাতীয় তাবিজ, হাড়, কড়ি, সূতা,

আয়েশা ﵂ হতে স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই মতের সাথে একমত পোষণ করেছেন আবু জা'ফর আল বাকের এবং ভিন্নমতে আহমাদ বিন হাম্বল, এবং তারা এই ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসকে এমন তাবিজ-কবজ না ঝুলানোর উপর অর্থ গ্রহণ করেছেন যাতে শিরক মিশ্রিত রয়েছে।

দ্বিতীয় মত ঃ পক্ষান্তরে অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরামদের মতে ও অন্যান্যদের মতে কোরআন ও হাদীসের তাবিজ ব্যবহার করা বৈধ নয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই মতের সাথে একমত হয়েছেন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ও ইবনে আব্বাস এবং ইহা হুজায়ফার স্পষ্ট অভিমত, উকবা বিন আমের এবং ইবুন আকীম। এই কথার সাথে তাবেঈনদের একটি জামায়াত একমত রয়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ইবনু মাসউদের সহচরবৃন্দ এবং আহমাদ বিন হাম্বল, আর এই মতকে তার (আহমাদ বিন হাম্বল) এর অনেক অনুসারীরা পছন্দ করেছেন। আর পরবর্তী মনীষিরা দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরেছেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ হতে বর্ণিত হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ বলেন। আমি রাসূল ﷺ কে একথা বলতে শুনেছিঃ

سمعت رسول الله ﷺ يقول(إن من الرقى والتمائم والتولة شرك).

সুতরাং সে তার আক্বীদাকে নষ্ট করবে ও তার প্রভূর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তাকে অপমান করবেন। তাই মুসলিম ব্যক্তির উপর তার আক্বীদাহ বিধ্বংসী বস্তু হতে রক্ষণাবেক্ষণ করা কিংবা তার আক্বীদাহ্কে ফাসাদ থেকে মুক্ত রাখা একান্ত কর্তব্য। তাই সে ঐ বস্তুর দিকে হাত বাড়াবে না, যে ঔষধ তার জন্য বৈধ নয়। আর সে ভেলকীবাজ-হাত সাফাইকারীদের নিকট তার রোগের চিকিৎসার জন্য যাবে না। কেননা তারা তার অন্তর ও আক্বীদাহকে রোগাক্রান্ত করে দিবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট।

আবার কেউ কেউ নিজ থেকেই এ সমস্ত জিনিষগুলো নিজের গায়ে ঝুলায়, এমতাবস্থায় তারা শারীরিক দিক থেকে রোগাক্রান্ত নয়, প্রকৃতপক্ষে সে ধারনা বসতঃ রোগে আক্রান্ত তা হল চক্ষু লাগা ও হিংসার ভয়। অথবা কেউ কেউ ঐ গুলো তার গাড়িতে ঝুলায়, চতুষ্পদ জন্তুর গলায় ঝুলায় কিংবা তার ঘরের দরজায় ঝুলায় বা তার দোকানে ঝুলায়। আর এসবই দুর্বল আক্বীদার বহিঃপ্রকাশ এবং আল্লাহর উপর অসম্পুর্ণ ভরসা। আর নিশ্চয় দুর্বল আক্বীদাই প্রকৃত ব্যাধী। আর এ ব্যাধীর চিকিৎসা করার জন্য সঠিক আক্বীদা ও একত্ববাদকে জানাই একান্ত কর্তব্য।

জুতার চামড়া লোহার কাটা, শয়তান ও জিনদের নামসমূহ এবং নানান মন্ত্র-তন্ত্র। এ সমস্ত নিঃসন্দেহে হারাম ও শিরক। কেননা পবিত্র আল্লাহ তায়ালার নামসমূহ ও গুনাবলী এবং তার কোরআনের আয়াত ব্যতীত অন্যের নামে এগুলি ঝুলায়। হাদীসে বর্ণিত আছেঃ

(من تعلق شيئاً وكل إليه).

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন কিছু (তাবিজ) গলায় লটকায় তাকে ঐ বস্তুর দিকে সোপর্দ করে দেয়া হবে। তার অর্থ হল আল্লাহ তাকে ঐ বস্তুর উপরই নির্ভরশীল করে দিবেন যা সে ঝুলিয়ে ছিল।

অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করবে ও তার কাছে আশ্রয় নিবে এবং নিজের সবকিছু সোপর্দ করে দিবে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট হবেন এবং সমস্ত অসাধ্যকে আয়ত্বে এনে দিবেন এবং তার জন্য সকল কঠিন জিনিষকে সহজ করে দিবেন।

আর যে ব্যক্তি তাকে (আল্লাহকে) বাদ দিয়ে অন্য কোন সৃষ্টির তাবিজ-কবজ, ঔষধ পত্র ও কবরসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে, আল্লাহ তাকে ঐ জিনিষের উপর নির্ভরশীল করে দিবেন, যা তাকে কোন কিছু থেকে বাধা প্রদান করতে পারবে না। আর তার জন্য কোন অপকার এবং কোন উপকার করতে পারবে না।

যায়, তবে এটা হবে শিরকে আকবার বা বড় শিরক। যেমন বর্তমান যুগের কবর পুজকদের অবস্থা। কেননা তারা কবরে শায়িত ব্যক্তিদেরকে যে সম্মান দেখায়, আল্লাহকে সম্মান ও ভয় করার চেয়ে তাদেরকে বেশী ভয় করে। এমন ভয় করে যে, যদি তাদের মধ্যে কারো কাছে তার ওলীর নামে শপথ করতে বলা হয়, যাকে সম্মান করে তবে তার নামে সত্য ব্যতীত শপথ করে না। আর যদি আল্লাহর নামে শপথ করতে বলা হয়, তাহলে তাঁর নামে শপথ করে, যদিও তার শপথটি মিথ্যা হয়।

সুতরাং শপথ করা, শপথকৃত জিনিষকেই তা'যিম করা হয়, যা আল্লাহর জন্যই একমাত্র প্রযোজ্য। আর আল্লাহর সাথে নম্রতা সহকারে শপথ করা কর্তব্য। সুতরাং যখন তখন বেশী বেশী করবে না, একথার ইঙ্গিতে আল্লাহ তায়ালার বাণী:

﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ﴾ (القلم: ١٠)

অর্থাৎ তুমি প্রত্যেক অধিক শপথকারী লাঞ্ছিত ব্যক্তিদের আনুগত্য করবে না। (সূরা কলমঃ১০)

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ﴾ (المائدة: ٨٩)

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের শপথের হেফাজত কর। (সূরা মায়িদাহঃ ৮৯)

একাদশতম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা ও কোন সৃষ্টির কাছে অসীলা খোজা এবং উদ্ধার প্রার্থনা করার বিধান।

(ক) আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করাঃ

حلف হাল্‌ফ এর প্রতিশব্দ হল يمين ইয়ামীন। আর হালফ বলা হয় বিশেষ পদ্ধতিতে কোন সম্মানিত বস্তুর নাম উল্লেখ করে কোন হুকুমকে সুদৃঢ় বা মজবুত করা। আর ত'যীম পাওয়া আল্লাহর হক। তাই আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম করা জায়েয নয়।

আলিমগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষন করেছেন যে, শপথ একমাত্র আল্লাহর নামে অথবা তাঁর অন্যান্য নামসমূহে ও গুনাবলীর সাথে হতে হবে। তাঁরা এ ব্যাপারেও একমত পোষণ করেছেন যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে তা করা যাবে না। (কিতাবুত তাওহীদের উপর ইবনে কাসেমের প্রদত্ব টিকা ৩০৩পৃষ্ঠা)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ এর বর্ননা মতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম করা শিরক।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেনঃ

(من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে কসম করলো সে কুফরী অথবা শিরক করলো। (আহমদ, তিরমিজী, হাকিম)

আর এটা হল ছোট শিরক। কিন্তু যদি শপথ কৃত জিনিষ শপথ কারীর নিকটে তার ইবাদত করার পর্যায় পৌঁছে

তাই আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের আচরণ বর্ণনা করে বলেছেন, যে তারা জেনে শুনে মিথ্যা শপথ করে।

এখানে উপরোক্ত বিষয়ের সার সংক্ষেপ বর্ণনা করলামঃ

১। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা হারাম। যেমন আমানতদারীর কসম অথবা কা'বা শরীফের কসম, কিংবা নাবীর ﷺ কসম। আর ইহা নিশ্চয় শিরক।

২। আল্লাহর নামে ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা শপথ করা, যাকে غموس বলা হয়। ইহাও হারাম।

৩। আল্লাহর নামে বেশী বেশী শপথ করা, যদিও সে এতে সত্যবাদী হয়। আর এ শপথ করার যদি প্রয়োজন না হয় তবে উহা হারাম হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে পবিত্র আল্লাহকে খাটো করে দেখানো হয়।

৪। প্রয়োজন হলে আল্লাহর নামে সত্য কসম করা জায়েয।

(খ) মাখলুক (সৃষ্টি) এর সাহায্যে আল্লাহ তায়ালার অসীলাহ সন্ধান করাঃ

التوسل (আততাওয়াসসুল) এর আভিধানিক অর্থ কোন বস্তুর নিকটবর্তী হওয়া এবং অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছে যাওয়া। আর الوسيلة (আল অসীলাহ) অর্থ নৈকট্য।

মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ وَابْتَغُوا إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ (المائدة: ٣٥)

অর্থাৎ তোমরা প্রয়োজন ছাড়া এবং সত্য ও নেকীর সময় ছাড়া শপথ করবে না। কেননা অধিক শপথ করা অথবা এমন শপথ করা যাতে মিথ্যার অবকাশ রয়েছে। এ উভয়ই আল্লাহকে তুচ্ছ করা ও তাকে অসম্মান করার উপর ইঙ্গিত বহন করে। আর এটা পূর্ণ একত্ববাদের পরিপন্থী। নিম্নে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ একথাটি স্পষ্ট করে দিয়েছেনঃ

(ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وجاء فيه: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه.)

অর্থাৎ তিনি ﷺ বলেছেনঃ (ক্বিয়ামতের দিন) তিন প্রকারের লোকের সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না এবং তাকে পবিত্র করবেন না। আর তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। এ হাদীসে একথা বলা হয়েছেঃ এমন লোক আছে যে তার আসবাবপত্রগুলো একমাত্র শপথের দ্বারা খরিদ করে,আর শপথের দ্বারাই বিক্রয় করে। (তাবরানী বিশুদ্ধ সূত্রে)

এ হাদীসে জানা গেল যে অধিক শপথের জন্য তার শাস্তি কঠোর করার হুশিয়ারী করা হয়েছে। ইহাতে প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ তায়ালার নামের সম্মানার্থে এবং পবিত্র আল্লাহর সম্মানার্থে অধিক শপথ করা হারাম। অনুরূপভাবে আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করাও হারাম। আর একেই বলা হয় يمين غموس যার অর্থ জেনে বুঝে মিথ্যা শপথ করা।

তাই আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের আচরণ বর্ণনা করে বলেছেন, যে তারা জেনে শুনে মিথ্যা শপথ করে।

এখানে উপরোক্ত বিষয়ের সার সংক্ষেপ বর্ণনা করলামঃ

১। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা হারাম। যেমন আমানতদারীর কসম অথবা কা'বা শরীফের কসম, কিংবা নাবীর ﷺ কসম। আর ইহা নিশ্চয় শিরক।

২। আল্লাহর নামে ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা শপথ করা, যাকে غموس বলা হয়। ইহাও হারাম।

৩। আল্লাহর নামে বেশী বেশী শপথ করা, যদিও সে এতে সত্যবাদী হয়। আর এ শপথ করার যদি প্রয়োজন না হয় তবে উহা হারাম হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে পবিত্র আল্লাহকে খাটো করে দেখানো হয়।

৪। প্রয়োজন হলে আল্লাহর নামে সত্য কসম করা জায়েয।

(খ) মাখলুক (সৃষ্টি) এর সাহায্যে আল্লাহ তায়ালার অসীলাহ সন্ধান করাঃ

التوسل (আততাওয়াসসুল) এর আভিধানিক অর্থ কোন বস্তুর নিকটবর্তী হওয়া এবং অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছে যাওয়া। আর الوسيلة (আল অসীলাহ) অর্থ নৈকট্য।

মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ وَابْتَغُوٓاْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ (المائدة: ٣٥)

অর্থাৎ তোমরা তাঁর (আল্লাহর) নিকট অসীলাহ সন্ধান কর। সূরা মায়িদাহঃ ৩৫)

অর্থাৎ এই আয়াতে অসীলার অর্থ হল পবিত্র আল্লাহর আনুগত্য করার মাধ্যমে এবং নিজেকে তাঁর সন্তুষ্টির অধীন করার মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ করা।

আর তাওয়াসসুল দু ভাগে বিভক্তঃ

প্রথম ভাগঃ শরীয়ত সম্মত তাওয়াসসুল।

দ্বিতীয় ভাগঃ শরীয়ত অসম্মত তাওয়াসসুল।

একঃ আল্লাহর নাম ও গুনাবলীর মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জন করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা তাঁর ভাষায় নির্দেশ করেছেন

﴿ وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ (الأعراف: ١٨٠)

অর্থাৎ আল্লাহর জন্য রয়েছে সর্বোত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তোমরা তাঁকে ডাক। আর তাদের বর্জন কর, যারা তার নামের ব্যাপারে বাকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃত কর্মের ফল শীঘ্রই পাবে। (সূরা আ'রাফঃ ১৮০)

দুইঃ ঈমান ও সৎআমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা, যার মাধ্যমে নৈকট্য লাভ কারীরা তা অর্জন করে। যেমন আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের সম্পর্কে বলেছেনঃ

﴿رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ﴾ (آل عمران: ١٩٣)

অর্থাৎ হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিত রূপে শুনেছি একজন আহবানকারীকে ঈমানের প্রতি আহবান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন। তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা। অত:পর আমাদের সকল গুনাহ মাফ কর এবং আমাদের সকল দোষত্রুটি দূর করে দাও। আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে। (সূরা আল ইমরানঃ ১৯৩)

আর যেমন হাদীসে উল্লেখিত ঐ তিন ব্যক্তির ঘটনা, যাদের উপর শিলাখণ্ড চাপা পড়েছিল। তারপর তাদের পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন তারা বের হতে সক্ষম হয়নি। তখন তারা তাদের সৎ আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট অসীলাহ গ্রহণ করল তৎক্ষনাত আল্লাহ তাদের পথ খুলে দিলেন। তারপর তারা বের হয়ে চলে যায়। (বুখারী, মুসলিমের হাদীসের বিষয় বস্তু)

তিনঃ আল্লাহর একত্ববাদে স্বীকারোক্তির মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ করা। যেমন ইউনুস عليه السلام নৈকট্য লাভ করেছিলেন।

﴿ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ ﴾ (الأنبياء: ٨٧

অতঃপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহবান করলেন, আপনি ব্যতীত কোন সত্যিকার উপাস্য নেই, আপনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। (সূরা আম্বিয়াঃ৮৭)

চারঃ আল্লাহর নিকট দুর্বলতা, প্রয়োজন ও দারিদ্রতা প্রকাশের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা। যেমন হযরত আইয়ুব عليه السلام বলেছিলেন

﴿ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (الأنبياء: ٨٣)

আমি দুঃখ কষ্টে পতিত হয়েছি, আর আপনি দয়াবানদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ দয়াবান। (সূরা আম্বিয়াঃ৮৩)

পাচঃ জীবিত নেক লোকদের দুয়ার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা। যেমন সাহাবায়ে কেরামগণ যখন অনাবৃষ্টির সম্মুখীন হতেন, তখন তাঁরা নবীজির কাছে আবেদন জানাতেন তিনি ﷺ যেন তাদের জন্য আল্লাহর নিকট পানি চেয়ে দুয়া করেন। অতঃপর যখন তিনি ﷺ মারা গেলেন, তারা রাসূলের চাচা আব্বাস ﷺ এর কাছে আবেদন করতেন, তিনি যেন তাদের জন্য আল্লাহর নিকট পানি তলব করেন। (বুখারী)

ছয়ঃ পাপ স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আল্লাহর নিকট অসীলা সন্ধান করা।

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ﴾ (القصص: ١٦)

অর্থাৎ তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক, আমি তো নিজের উপর জুলুম করে ফেলেছি। অতএব,আমাকে ক্ষমা কর। (সূরা কাসাসঃ১৬)

দ্বিতীয় ভাগ

শরীয়ত অসম্মত তাওয়াস্‌সুলঃ আর এ হল মৃত ব্যক্তিদের নিকট থেকে দুয়া ও সুপারিশ তলব করার মাধ্যমে অসীলাহ সন্ধান করা, ও নাবী কারীম (ﷺ) এর মর্যাদা এবং সৃষ্টি জগতের সত্তা অথবা তাদের অধিকার উল্লেখ করে অসীলাহ সন্ধান করা। আর উহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ

১। মৃত ব্যক্তিদের নিকট দুয়া চাওয়া অবৈধঃ

কেননা মৃত ব্যক্তি দুয়া শুনার উপর ক্ষমতা রাখে না, যেমন জীবিত অবস্থায় ক্ষমতা রাখতে সক্ষম হয়। আর মৃত ব্যক্তিদের নিকট থেকে সুপারিশ তলব করাও বৈধ নয়। কেননা উমর ইবনুল খাত্তাব ও মুয়াবিয়াহ ইবনে আবি সুফিয়ান আর তাদের দুজনের উপস্থিতিতে যেসব সাহাবায়ে কিরাম - সবার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হন- এবং তাবিঈগণ -তাদের প্রতি রহমত বর্ষিত হোক- যখন তাঁরা অনাবৃষ্টির সম্মুখীন হতেন, তখন তাঁরা জীবিত ব্যক্তিকে মাধ্যম করে বৃষ্টি চাইতেন ও অসীলাহ সন্ধান করতেন এবং সুপারিশ তলব করতেন। যেমন আব্বাস (رضي الله عنه) ও ইয়াযিদ বিন আসওয়াদ (রহ) ইনারা

দুজনকে মাধ্যম করে অসীলাহ তালাশ করতেন। পক্ষান্তরে তাঁরা আল্লাহর নাবীর কবর ও অন্যান্যদের কবরের কাছে গিয়ে অসীলাহ, সুপারিশ ও পানি তলব করতেন না, বরং তারা বিকল্প পথ অবলম্বন করতেন, যেমন আব্বাস (رضي الله عنه) ও ইয়াযিদের (رضي الله عنه) নিকট যেতেন । হযরত উমর (رضي الله عنه) বলেনঃ

﴿اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا لتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا﴾

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট আমাদের নাবীর অসীলা ধারণ করলে তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দিয়ে থাকতে, আর এখন আমরা তোমার নিকট আমাদের নাবীর চাচার অসীলাহ ধারণ করছি। অতএব আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর।

যখন শরীয়ত সম্মত ভাবে তাঁদের দ্বারা অসীলাহ গ্রহণ করা অসুবিধা হয়ে পড়ল, যা তারা পূর্বে করত, তখন তাঁরা উহার বিকল্প হিসেবে এমন করতে শুরু করে । আর নিশ্চয় এমন করা সম্ভব ছিল যে, তাঁরা নাবী (ﷺ) এর কবরের নিকট এসে তাঁকে অসীলাহ বানাবে। অর্থাৎ এই পন্থা যদি জায়েয হত তবে তাঁরা তাই করতেন। (মাজমুউল ফাতওয়া ১/৩১৮-৩১৯ পৃষ্ঠা)

সুতরাং তাঁদের একাজ বর্জন করা প্রমাণ করে যে, মৃত ব্যক্তিদের দ্বারা অসীলাহ তালাশ করা না জায়েয। তাদের কাছে দুয়া ও সুপারিশ চাওয়াও অবৈধ। সুতরাং যদি তাঁর (ﷺ) নিকট জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় দুয়া চাওয়া এবং

তাঁর মাধ্যমে সুপারিশ তলব করা সমান হতো তাহলে তাঁরা তাঁকে (ﷺ) বাদ দিয়ে তুলনামূলক যে নিম্ন মানের তার কাছে তাঁরা যেতেন না।

২। নাবী কারীম (ﷺ) এর মর্যাদা অথবা অন্য কারো মর্যাদার দোহাই দিয়ে অসীলাহ্ তলব করা বৈধ নয়ঃ

আর এ ব্যাপারে যে হাদীসটি এসেছেঃ

(إذا سألتم الله فاسئلوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم).

অর্থাৎ যখন তোমরা আল্লাহর কাছে কিছু চাবে, তখন তোমরা তাঁর কাছে আমার মর্যাদাকে অসীলাহ করে চাবে। কারণ আমার সম্মান আল্লাহর নিকট বিরাট বিষয়।

এ হাদীসটি বানোয়াট মুসলমানদের হাদীসের কোন গ্রন্থে এর কোন ভিত্তি নেই যার উপর নির্ভর করা যায় এবং কোন হাদীস বিষারদও এ হাদীসটি বর্ণনা করেন নি। (মাজমুউল ফাতওয়া ১০/৩১৯পৃঃ)

আর যাতে বিশুদ্ধ প্রমাণ নেই তা অবৈধ। কেননা স্পষ্ট সঠিক প্রমাণ ব্যতীত যে কোন ইবাদত সাব্যস্ত হয় না।

৩। সৃষ্টি জগতের সত্তার দোহাই দিয়ে অসীলাহ তালাশ করা অবৈধঃ

কেননা باء অক্ষরটি যদি শপথ এর জন্য ব্যবহৃত হয়, তবে

উহার দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালার নিকট শপথ করার অর্থ প্রদান করে। আর যখন এক মাখলুখ দ্বারা মাখলূকের উপর শপথ দেয়া হয়, তখন উহা না জায়েয হবে এবং তা শিরক হবে। যেমন হাদীস দ্বারা বুঝা যায়। সুতরাং কিভাবে মহান সৃষ্টিকর্তার উপর সৃষ্ট জীবের শপথ দেয়া যাবে? আর যদি باء অক্ষরটি سببيه অথবা কারণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে পবিত্র আল্লাহ তায়ালা মাখলুকের দ্বারা সওয়াল করাকে কবূলের কারণ হিসেবে গণ্য করেন নি।

৪। সৃষ্টি জগতের অধিকারের অসীলা গ্রহণ দুটি কারণে অবৈধ।

প্রথম কারণ: নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র। তাঁর উপর কারও কোন অধিকার নেই । কেবল তিনি (আল্লাহ) মাখলুকের উপর উহার অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الروم: ٤٧)

অর্থাৎ মুমিনদের সাহায্য করা আমার হক বা অধিকার । (সূরা রূম-৪৭)

তবে কেবল আনুগত্যশীল বান্দারা তাঁর প্রতিদানের হকদার ইহা হল পুরস্কার ও অনুগ্রহের অধিকার লাভ। ইহা কোন জিনিসের মোকাবেলায় অধিকার নয়। যেমন এক মাখলুক অন্য মাখলুকের উপর অধিকার রাখে।

দ্বিতীয় কারনঃ ইহা এমন অধিকার যা দ্বারা তাঁর বান্দাদের উপর অনুগ্রহ করেন । ইহা একমাত্র তাঁর সাথে খাছ। এই অধিকার কারও সাথে সম্পৃক্ত নয়। যখন কোন অধিকার চর্চাকারী সত্তা ইহা দ্বারা অসীলা গ্রহণ করবে, তখন সে এমন অপরিচিত কাজের অসীলা হিসেবে গন্য হবে, যার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। এই অসীলা দ্বারা সে কিছুই পাবে না। এ ব্যাপারে যে হাদীসটি বির্ণত আছেঃ

أسألك بحق السائلين.

অর্থাৎ আমি সওয়ালকারীদের অধিকার দ্বারা চাইতেছি। ইহা অসীলা হিসেবে সাব্যস্ত নয়। কেননা ইহার সনদে আতিয়া আল আউফি রয়েছে। যে দুর্বল হিসেবে গন্য। তার জয়িফ বা দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সর্বসম্মত। যেমন কোন কোন মুহাদ্দিস একথাটি বলেছেন । আর যে হাদীস এই রকম হবে তা আক্বীদার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর দলীল হিসেবে গ্রায্য হবে না। তাছাড়া এ বিষয়ে কোন নিদৃষ্ট ব্যক্তি বিশেষের অধিকার দ্বারা অসীলা গ্রহণ করা সাব্যস্ত হয় না। বস্তুত: প্রার্থনাকারীদের অধিকার হল তাদের প্রার্থনা কবুল করা, যেমন আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে তাদের সাথে ওয়াদা করেছেন। উহা এমন অধিকার যা আল্লাহ স্বীয় সত্তার উপর তাদের জন্য ওয়াজীব করেছেন। তার উপর কেউ ওয়াজীব করেননি। তাই উহা সত্য ওয়াদা দ্বারা অসীলা গ্রহণ করা মাত্র মাখলুকের অধিকার দ্বারা নয়।
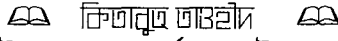
(গ) সৃষ্টির নিকট সাহায্য প্রার্থনা ও উদ্ধার প্রার্থনার বিধানঃ

الاستعانة আল ইসতেআনাহ অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা এবং কোন বিষয় বা কাজে সহানুভূতি প্রার্থনা করা।

আর الاستغاثه আল ইসতেগাসাহ হল উদ্ধার প্রার্থনা করা ও বিপদ বা কোন সমস্যা দূর করা।

সুতরাং মাখলুকের বা সৃষ্টির নিকট সাহায্য প্রার্থনা ও উদ্ধার প্রার্থনা দু প্রকারঃ

প্রথম প্রকারঃ মাখলুক বা সৃষ্টিকূল যে কাজ করতে সক্ষম সে কাজের জন্য তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং উদ্ধার প্রার্থনা করা বৈধ। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেনঃ

﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى ﴾ (المائدة: ٢)

অর্থাৎ তোমরা তাক্বওয়া ও নেকীর কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর। (সূরা মায়িদাহঃ২)

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ﴾ (القصص: ١٥)

অত:পর যে তার নিজ দলের সে তার শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। (সূরা ক্বাসাসঃ১৫)

দ্বিতীয় প্রকারঃ সৃষ্টিকুল যে কাজ আল্লাহ ব্যতীত করতে সক্ষম নয়, সে কাজের জন্য তার কাছে সাহায্য ও উদ্ধার

প্রার্থনা করা। যেমন মৃত ব্যক্তির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা। আর জীবিতদের নিকট উদ্ধার প্রার্থনা করা ইত্যাদি। আল্লাহ ব্যতীত সৃষ্টিকুল যে কাজ করতে সক্ষম নয়, যেমন রোগীদের রোগ থেকে মুক্ত করা এবং মহা আপদ বিপদ দূরীভূত করা ও ক্ষতিকারক জিনিষকে প্রতিহত করা। এ প্রকার প্রার্থনা অবৈধ এবং শিরকে আকবার বা বড় শিরক।

নাবী ﷺ এর যামানায় এমন মুনাফিক ছিল যে, মুমিনগণকে কষ্ট দিত। তাদের মধ্য থেকে কেউ বললেন, আপনারা আমাদের সাথে চলুন আমরা রাসূলের কাছে গিয়ে এই মুনাফিক হতে বাঁচার জন্য উদ্ধার প্রার্থনা করি ঃ তখন নবী (ﷺ) বললেনঃ

إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.

আমার কাছে উদ্ধার প্রার্থনা করা যাবে না। কেবল মাত্র আল্লাহর নিকটেই উদ্ধার প্রার্থনা করা যাবে। (তাবরানী, দূর্বল সূত্রে বর্ণিত)

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অধিকারের ক্ষেত্রে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করা অপছন্দ করেছেন। আল্লাহর একত্ববাদকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং শিরকের পথগুলো বন্ধ করার জন্য এবং স্বীয় রবের আনুগত্য ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার জন্য, আর তার কথায় ও কাজে শিরকের মাধ্যমগুলো থেকে উম্মাতে মুসলিমাহকে সাবধান করার উদ্দেশ্যে নাবী কারীম ﷺ তাঁর

ব্যাপারে এ ধরণের শব্দ ব্যবহার করা অপছন্দ করতেন। নাবী ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় যে কাজ করতে সক্ষম হতেন, সে ব্যাপারে যদি এমন হুকুম বা বিধান হয়, তবে তাঁর মৃত্যুর পর কি ভাবে তার নিকট উদ্ধার প্রার্থনা বৈধ হবে? অথচ তারা তাঁর কাছে কিছু এমন কাজ চায় যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা করতে সক্ষম, অন্য কেউ না। আর যখন ইহা রাসূল ﷺএর ব্যাপারেই অবৈধ তাহলে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ব্যাপারে আরো উত্তম ভাবে অবৈধ হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মর্মে এবং তাঁর আহলে বায়ত বা পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কেরাম এর মর্মে যতটুকু আক্বীদা রাখা অপরিহার্য বা কর্তব্য আর ইহা নিম্নোক্ত পরিচ্ছেদ সমূহে বিভক্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাবী ﷺ কে ভালবাসা ও তাঁকে সম্মান করা কর্তব্য এবং তাঁর প্রশংসায় ও মর্যাদায় বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করা নিষিদ্ধ।

রাসূলে কারীম ﷺ) কে ভালবাসা ও তাঁকে সম্মান করা ওয়াজিব এবং তাঁর প্রশংসা ও মর্যাদা নিরূপনে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন নিষিদ্ধ।

একঃ রাসূলুল্লাহ ﷺকে ভালকবাসা এবং তাকে তা'যীম করা কর্তব্যঃ

বান্দার উপর সর্ব প্রথম ওয়াজিব বা কর্তব্য হল মহান আল্লাহকে ভালবাসা। আর ইহা অন্যতম ইবাদত। আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে বলেনঃ

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ (البقرة: ١٦٥)

অর্থাৎ যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা তুলনায় বহুগুণে বেশী। (সূরা বাক্বারা ১৬৫)

কেননা তিনি (আল্লাহ) এমনই রব যে তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব ধরনের নিয়ামত তিনি তাঁর বান্দাদের উপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত দানকারী। তারপর আল্লাহ তায়ালাকে ভালবাসার পর তাঁর রাসূল ﷺ কে ভালাবাসা অপরিহার্য। কেননা তিনি আল্লাহর পথে মানুষকে আহবান করেছেন ও তাঁর পরিচয় স্পষ্টভাবে অবগত করিয়েছেন, ও তার শরীয়তকে মানুষের কাছে যথাযথভাবে পৌছিয়ে দিয়েছেন এবং দ্বীনের হুকুম আহকাম বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। অত:পর মুমিনদের জন্য যা কিছু দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ অর্জিত হয়েছে তা একমাত্র রাসূলের ﷺ মাধ্যমেই সরবরাহ হয়েছে। তাঁর ﷺ আনুগত্য ও অনুকরণ ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এই মর্মে হাদীসে বর্ণিত আছে তা হল এইঃ

(ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.)

অর্থাৎ যার মধ্যে তিনটি জিনিস বিদ্যমান আছে সে ব্যক্তি এগুলো দ্বারা ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পেরেছে।
১। তার কাছে আল্লাহ ও তার রাসূল সর্বাধিক প্রিয় হওয়া।
২। একমাত্র আল্লাহ তায়ালার (সন্তুষ্টি লাভের) জন্য কোন ব্যক্তিকে ভালবাসা।
৩। আল্লাহ তায়ালা তাকে কুফরী থেকে উদ্ধার করার পর পুনরায় কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করা, তার কাছে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতই অপছন্দনীয় হওয়া। (বুখারী ও মুসলিম)

সুতরাং রাসূল ﷺ কে মহব্বত করা আল্লাহ তায়ালার মহব্বতের অনুগত হওয়া অবধারিত। আর সম্মানের দিক দিয়েও দ্বিতীয় স্তরে। রাসূল ﷺ কে স্বতন্ত্র ভাবে ভালবাসার কথা এবং তাঁর ভালাবাসাকে অগ্রাধিকার দেয়া আল্লাহ ব্যতীত সকল প্রিয় বস্তুর উপর ভালবাসার কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তা নিম্নরূপঃ

(لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين).

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে ততক্ষণ কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষন না আমি তার কাছে তার সন্তান- সন্ততি, পিতা-মাতা এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হই। (বুখারী ও মুসলিম) এবং ইহাও বর্ণিত হয়েছে যে মুমিন ব্যক্তির নিজের আত্মার চেয়ে রাসূলকে ভালবাসা ওয়াজিব। এই মর্মে যেমন হাদীসে এসেছেঃ

أن عمر بن الخطاب ﷺ قال يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك؛ فقال له عمر: فإنك الأن أحب إلي من نفسي فقال؛ الأن يا عمر.

অর্থাৎ উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনি আমার নিকট আমার নিজের আত্মা ছাড়া সবচেয়ে প্রিয় তখন তিনি ﷺ বললেন যার হাতে আমার জীবন, তার শপথ যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার নিকট তোমার আত্মার চেয়ে প্রিয় না হবো, ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন নও। তখন উমর ﷺ বললেন এখন আপনি আমার নিকট আমার আত্মার চেয়েও অধিক প্রিয়। তদুত্তরে নাবী ﷺ বলেলেনঃ হে উমর এখন? (বুখারী)

সুতরাং এতে বুঝা যায় যে নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ কে ভালবাসা ওয়াজিব এবং আল্লাহ ব্যতীত সকল বস্তুর উপর প্রাধান্য দেয়া অপরিহার্য কর্তব্য। কেননা এটা উহার তাবে এবং উহার জন্য অপরিহার্য। এইজন্য যে তাকে ভালবাসা মানে আল্লাহকে ভালাবাসা এবং তার উদ্দেশ্যে ভালবাসা। মুমিনদের অন্তরে ভালবাসা বৃদ্ধি পায় আল্লাহকে ভালবাসা বৃদ্ধির ফলে এবং আল্লাহর ভালবাসা কম হলে মহব্বত কমে যায়। আর যেই আল্লাহর জন্য ভালবাসে, একমাত্র আল্লাতেই

ভালবাসে আর নাবী ﷺ কে ভালবাসার অর্থ তাঁর সম্মান করা ও ইজ্জত করা, তাঁর আনুগত্য করা ও সকলের বক্তব্য ও মতামতের উপর তাঁর ﷺ মতামতকে প্রাধান্য দেয়া এবং তাঁর সুন্নাতের তা'যীম করা।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম বলেনঃ প্রত্যেক মানুষকে মহব্বত করা ও তা'যীম করা একমাত্র বৈধ হবে আল্লাহকে ভালবাসা ও সম্মান করার পরে। যেমন রাসূলুল্লাহকে ভালবাসা ও তাঁকে সম্মান করাই হচ্ছে তাঁকে প্রেরণকারীকে (আল্লাহ) ভালবাসা ও সম্মান করার পূর্ণতা। কেননা তাঁর উম্মত তাঁকে ভালবাসে আল্লাহকে ভালাবাসার জন্যই এবং তাকে সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে থাকে আল্লাহকে মর্যাদা দেয়ার জন্যে । অতএব এ ভালবাসা আল্লাহকে ভালবাসার দাবী।

আর ফলকথা আল্লাহ তায়ালা নাবীর ﷺ প্রতি দান করেছিলেন ভয়ভীতি ও প্রেমপ্রীতি। আর এই জন্য কোন লোক অন্য কোন লোককে তার চেয়ে বেশী যতটুকু ভালবাসা ও ভয় ছাহাবাগণ রাসূলকে করতেন। ভাল বাসতেন না ও তার চেয়ে অন্য কাউকে বেশী ভয় করতেন না। হযরত আমর বিন আস ইসলাম গ্রহণ করার পর বলেন, যে আমার নিকট তাঁর (নবীর) চেয়ে বেশী নিকৃষ্ট ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন না। আর ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর চেয়ে বেশী সম্মানিত ব্যক্তি কেউ ছিলেন না। তিনি বলেছেনঃ আমাকে যদি জিজ্ঞাসা

করা হয় যে, আমি আপনাদের নিকট তাঁর ﷺ গুন বর্ণনা করি, তবে আমি তাঁর গুণ বর্ণনায় সক্ষম নই। কেননা আমার দৃষ্টিতে তাঁর চাইতে অধিক সম্মানী আর কেউ নেই।

উরওয়াহ বিন মাসউদ কোরাইশদেরকে লক্ষ করে বলেছিলেনঃ হে আমার গোত্রের লোকেরা! আল্লাহর শপথ আমি কিসরা ও কায়সার ছাড়াও অনেক দেশে রাষ্ট্রদূত হিসেবে ভ্রমন করেছি। কিন্তু কোন একটি রাজা বাদশাহকেও দেখিনি যে তাদের সহচরবৃন্দরা তাদেরকে এত বেশী সম্মান করে, যতটুকু সম্মান মুহাম্মাদ ﷺ কে তাঁর সাহাবায়ে কিরাম করে থাকে। আল্লাহর শপথ, তাঁর সম্মানের জন্য তাঁদের দৃষ্টিকে তাঁর প্রতি সীমাবদ্ধ করতে পারতেন না। তিনি যখনই থুথু ফেলতেন তখন তা কারো না কারো হাতে পড়ত। সে ব্যক্তি তা তার চোহারায় ও বক্ষে মর্দন করত। আর যখন তিনি অজু করতেন, তখন তার অজুর পানি নেয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হত। (জালাউল আফহাম পৃঃ ১২০-১২১)

দুইঃ রাসুলুলাহ ﷺ এর প্রশংসায় বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন নিষিদ্ধ:

غلو (গুলু) হচ্ছে, সীমালংঘন করা আরবীর পরিভাষায় বলা হয় غلا غلواً যখন সম্মানের সীমা অতিক্রম করে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ (النساء: ١٧١)

অর্থাৎঃ তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে সীমালংঘন করো না। (সূরা নিসাঃ ১৭১)

আর إطراء (ইতরা) হল প্রশংসায় সীমালংঘন করা এবং তাতে মিথ্যারোপ করা। আর নাবী ﷺ এর অধিকার মর্মে সীমালংঘন অর্থ তার মর্যাদা নির্ণয়ে এমন ভাবে সীমা অতিক্রম করা , যে তার রিসালাতের পজিশনকে ছাড়িয়ে যাওয়া এবং তার জন্য উপাস্যের কোন বৈশিষ্ট নির্ধারণ করা। এভাবে যে আল্লাহ ব্যতীত তার কাছে প্রার্থনা করা এবং তার দ্বারা উদ্ধার চাওয়া ও তার নামে শপথ করা।

আর নাবী কারীম ﷺ এর অধিকারের ব্যাপারে সীমালংঘন করার অর্থ হল, তার মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করা । নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ভাষায় এ রকম প্রশংসা করা হতে নিষেধ করেছেনঃ

(لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله) .

অর্থাৎ: তোমরা আমার মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করো না যেমনি ভাবে প্রশংসা করেছিল নাসারারা মরিয়মের পুত্র ঈসা عليه السلام এর। আমি আল্লাহ তায়ালার বান্দা মাত্র। তাই তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং তারই রাসূল বলবে। (বুখারী)

এর অর্থ হল তোমরা আমার মিথ্যা প্রশংসা করো না, আর আমার প্রশংসা জ্ঞাপনে সীমাতিরিক্ত প্রশংসা করো না। যেমনি ভাবে নাসারারা মারিয়ামের পুত্র ঈসার عليه السلام ব্যাপারে সীমালংঘন করেছিল, অত:পর তারা তাঁর উলুহিয়্যাতের দাবী করেছিল। এবং তোমরা আমার সেইগুন বর্ণনা কর যে গুনে আমার প্রভূ আমাকে গুণান্বিত করেছেন। সুতরাং তোমরা আমাকে বল আল্লাহর বান্দাহ এবং তাঁরই রাসূল। আর যখন তাঁর কোন সাহাবী তাঁকে বলল। আপনি আমাদের সরদার তদুত্তরে তিনি বললেন:-

السيد: الله تبارك وتعالى

অর্থাৎ: বরকতময় মহান আল্লাহই হলেন, একমাত্র "প্রভূ"। আর তারা যখন বললেন আপনি আমাদের মধ্যে মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বোত্তম এবং আমাদের মধ্যে সর্বাধিক দানশীল ও ধৈর্য্যশীল। তৎক্ষণাৎ বললেনঃ

(قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان)

অর্থাৎঃ তোমরা (এ শব্দ ছাড়া) যা বলছিলে তাই বল। শয়তান যেন তোমাদের উপর সওয়ার না হতে পারে। (আবু দাউদ উত্তম সনদে)

কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ কে লক্ষ্য করে আরো বললো: হে আমাদের রাসূল! হে আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম

ব্যক্তি ও সর্বোত্তমের সন্তান, আমাদের সরদার এবং আমাদের সর্দারের সন্তান। তখন তিনি বললেনঃ

(ياأيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق مترلتي التي انزلني الله عز وجل) .

অর্থাৎঃ হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের (পূর্বের) কথা বলে যাও। শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করতে না পারে। আমি হচ্ছি মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দাহ এবং তার রাসূল। আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে মর্যাদার স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন, তোমরা এর উর্ধে আমাকে স্থান দাও এটা আমি পছন্দ করি না। (আহমদ, নাসাঈ)

নাবী কারীম ﷺ তাঁকে নিম্নোক্ত শব্দগুলির দ্বারা তার প্রশংসা করাকে অপছন্দ করেছেন,যেমন

(أنت سيدنا أنت خيرنا أنت أفضلنا أنت أعظمنا.)

তিনি ﷺ সার্বিকভাবে তাদের মধ্যে উত্তম এবং সৃষ্টির সেরা হওয়া সত্ত্বেও এ ধরণের শব্দ ব্যবহার করা তাঁর ব্যাপারে অপছন্দ করতেন। কিন্তু তিনি আল্লাহর একত্ববাদের রক্ষার্থে এবং তাঁর অধিকারের ব্যাপারে সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি হতে তাদেরকে দূরে রাখার জন্য উহা বলতে নিষেধ করেন। তাদেরকে এনুরূপ বলতে নির্দেশ দেন, যেন তারা তাঁকে এমন দুটি গুনের দ্বারা তাঁর প্রশংসা করে, যা বান্দাহর জন্য সবচেয়ে

বেশী সম্মানিত। তাতে কোন প্রকারের বাড়াবাড়ি নেই এবং আক্বীদার প্রতি ক্ষতিকর আশংকাও নেই তা হল عبد الله ورسوله বলা, আর তিনি ইহা পছন্দ করেননি যে মহান আল্লাহ তাকে যে সম্মানে ভুষিত করে সন্তুষ্ট হয়েছেন, তার চেয়ে অধিক সম্মান উঁচু করে বলুক। অথচ অনেক লোকই তাঁর নিষেধাজ্ঞার বিরোধীতা করে তাঁকে আহবান করতে লাগে এবং তাঁর নিকট উদ্ধার প্রার্থনা করতে লাগে এবং তাঁর নামে শপথ শুরু করে এবং তাঁর নিকট এমন বস্তু চায় যা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে পাওয়া যায় না। যেমন ভাবে তারা মীলাদ মাহফিলে কবিতা আবৃত্তিতে এবং ইসলামী সংগীতে করে থাকে, আর তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ অধিকারের মাঝে কোনরূপ সঠিক- বেঠিকের তারতম্য করে না।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ) তাঁর নূনীয়াহ কবিতার দুটি চরণ উল্লেখ করেছেন-

لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان

لا تجعلوا الحقين حقا واحداً من غير تمييز ولا قربان

অর্থাৎঃ আল্লাহর এমন হক্ব রয়েছে যা তিনি ছাড়া আর কারো নেই। তার বান্দার ও হক্ব রয়েছে। উহা হচ্ছে পৃথক পৃথক দুটি হক্ব, তোমরা এ দুটি হক্বকে পৃথক না করে একটি

হক্বে পরিণত করো না এবং দুটি হক্বকে নিকটবর্তী করে দিওনা।

তিন: রাসূল ﷺ এর মর্যাদার বিবরণ: মহান আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নাবীর যে সমস্ত প্রশংসাবলী বর্ণনা করেছেন এবং যে সমস্ত সম্মানে তাঁকে মর্যাদাবান করেছেন, সে সমস্ত সম্মান ও মর্যাদা বর্ণনায় কোন ক্ষতি নেই । আর উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, আর তার এমন উচ্চ মর্যাদা রয়েছে যাতে তিনি ভুষিত করেছেন , তাহলঃ আব্দুল্লাহ বা আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল এবং সমস্ত মাখলুকের মধ্যে তিনি সার্বিক ভাবে উত্তম এবং তিনি সকল মানুষের নিকট একচ্ছত্র ভাবে আল্লাহর রাসূল, এবং সমস্ত জ্বিন ও ইনসানের নিকট রাসূল হিসেবে প্রেরিত, রাসূলদের মধ্যে সর্বোত্তম, তিনি সর্বশেষ নবী, যার পরে আর কোন নবী নেই। আল্লাহ তার জন্য তার নাবীর বক্ষ খুলে দিয়েছিলেন এবং তাঁর বর্ণনা সমুন্নত করেছেন। যারা তার নির্দেশের বিরুধিতা করেছে তাদের লাঞ্চনা ও অবমাননা নির্ধারিত করেছেন। তিনি মাক্বামে মাহমূদ বা প্রশংসিত স্থানের অধিকারী । আল্লাহ তায়ালা তার নাবীর মর্যদা মর্মে যা বলেছেন তা হলঃ

﴿ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾ (الإسراء: ٧٩)

অর্থাৎ: এমন জায়গা যেখানে আল্লাহ তায়ালা তাকে কিয়ামতের দিন মানুষের শাফায়াতের জন্য দাড় করাবেন।(সূরা ইসরাঃ৭৯)

তার অর্থ হল এমন স্থান যেখানে তাকে কিয়ামতের দিন মানুষের সুপারিশ করার জন্য দাড় করাবেন, তাদের প্রভূ তাদেরকে কঠিন অবস্থান থেকে শান্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে । এ স্থানটি তাঁর জন্য নির্ধারিত, অন্য কোন নাবীর জন্য নয়। তিনি সমস্ত সৃষ্টি কুলের মাঝে আল্লাহকে সর্বাধিক ভয়কারী এবং তাকওয়া অর্জনকারী ছিলেন। আর তিনি (আল্লাহ) নাবী কারীম ﷺএর উপস্থিতিতে কাউকে উচ্চস্বরে কথা বলতে নিষেধ করেছেন এবং ঐ ব্যক্তিদের প্রশংসা করেছেন, যারা তাদের কণ্ঠস্বরকে তাঁর সামনে নীচু করে রেখেছেন। তাই আল্লাহ তায়ালা তাঁর নাবীর প্রশংসা ও মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (الحجرات: ٢-٥)

অর্থাৎঃ হে মুমিনগণ! তোমরা নাবীর কণ্ঠ স্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উচু করো না এবং তোমরা একে অপরেরর সাথে যেরূপ উচ্চ স্বরে কথা বল , তার সাথে

সেরূপ উচ্চ স্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না। যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে শিষ্টাচারের জন্য শোধিত করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরষ্কার । যারা প্রাচীরের আড়াল থেকে আপনাকে উচ্চস্বরে ডাকে তাদের অধিকাংশই অবুঝ। যদি তারা আপনার বের হয়ে তাদের কাছে আশা পর্যন্ত ধৈর্য ধারন করত, তবে তাই তাদের জন্য মঙ্গলজনক হত। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সূরা হুজুরাতঃ ২-৫)

ইমাম ইবনে কাসীর বলেনঃ এই আয়াতগুলির মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে নাবী কারীম ﷺ এর সাথে কিরূপ সম্মান মর্যাদা , আনুগত্য ও মাহত্ম প্রকাশ করবে, সে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন। তারা নাবী ﷺ এর সামনে তাঁর কণ্ঠস্বরের চেয়ে তাদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করবে না। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তাঁর নাম ধরে ডাকতে নিষেধ করেছেন, যেমন ভাবে মানুষেরা এক অপরকে ডেকে থাকে। যেমন বলে থাকে হে মুহাম্মাদ। কেবল মাত্র নবুওয়াত ও রিসালাতের সম্পর্ক উল্লেখ করে আহবান জানাবে অর্থাৎ এমন বলবে (يا رسول الله يا نبي الله) আল্লাহ্ তায়ালা এ কথার অবতারণা করে বলেনঃ

﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا ﴾ (النور: ٦٣)

অর্থাৎঃ তোমরা যেমন ভাবে পরস্পরকে ডাকাডাকি কর তেমনি ভাবে রাসূল ﷺ কে ডেকো না। (সূরা নূরঃ৬৩)

যেমন পবিত্র আল্লাহ তাঁকে يا أيها النبي বলে সম্বোধন করতেন। আর আল্লাহ ও তাঁর ফিরিস্তারা তাঁর প্রতি দরূদ পাঠিয়েছেন এবং তাঁর বান্দাদেরকেও তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই তিনি (মহান আল্লাহ) বলেছেনঃ

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (الأحزاب:٥٦)

অর্থাৎ: আল্লাহ ও তার ফিরিশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ তোমরা নবীর জন্য রহমতের তরে দুয়া কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর। (সূরা আহযাবঃ৫৬)

কিন্তু তাঁর ﷺ প্রশংসা জ্ঞাপনের বিশেষ কোন সময় নির্ধারণ করা যাবে না এবং কোরআন ও সুন্নাহ থেকে সঠিক প্রমাণ ব্যতীত কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতিও অবলম্বন করা যাবে না। সুতরাং মীলাদ পালনকারী ব্যক্তিরা তাদের ধারণা মতে নাবীর জন্ম দিনকে তাঁর প্রশংসার উদ্দেশ্যে নির্ধারিত করে নিয়েছে এবং রীতিমত করে থাকে, তা জঘন্য বিদআত বা দিনের মধ্যে একটি নবাবিস্কৃত পন্থা। আর নাবী কারীম ﷺ এর সুন্নাতকে তা'জিম করা আর তদানুযায়ী আমল করা ওয়াজিব

হিসেবে বিশ্বাস করা, এবং কুরআন কারীমের উপর বিশ্বাস ও আমল করার পরই সুন্নাতের তা'যিম ও তার উপর আমল করার স্থান দ্বিতীয় হিসেবে বিশ্বাস করা, নাবী কারীম ﷺ কে তা'জিম করার অংশ বিশেষ। কেননা ইহাও আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ওহী হিসেবে গণ্য। যেমন মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ (النجم: ٣-٤)

অর্থাৎঃ এবং তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না ইহা কেবল ওহী যা প্রত্যাদেশ হয়। (সূরা নাজম:৩-৪)

অতএব, তাতে সন্দেহ করা এবং তার পজিশনকে খাট করে দেখা বৈধ হবে না। অথবা উহার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সহীহ কিংবা যয়ীফ বলে পন্থা ও সূত্রের উপরে আলোচনা ও সমালোচনা করা অথবা তার বিভিন্ন অর্থের ব্যাখ্যা করা, তাতে জ্ঞান ও আয়াত্ত করা ছাড়া বৈধ হবে না। বর্তমান যুগে রাসূলের সুন্নাতের বিরুদ্ধে অজ্ঞদের বাড়া-বাড়ি চরমে পৌছে গেছে। বিশেষ করে এমন কিছু উদীয়মান যুবক, যারা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম স্তরে অবস্থান করছে। তারা হাদীসের বিষয়ে সহীহ যয়ীফ হিসেবে পার্থক্য দেখাচ্ছে, আর তারা শুধু বই অধ্যয়ন ব্যতীত (মূল বিষয়ে) বিদ্যাহীন ভাবে বর্ণনাকারীদেরকে দোষারোপ করছে । যা তাদের জন্য ও উম্মতের জন্য বিরাট ক্ষতিকর।

সুতরাং তাদের কর্তব্য হল তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে

এবং তাদের জ্ঞানের পরিধিতে দাড়িয়ে যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আনুগত্য ও অনুকরণ করা ওয়াজিব

নাবী কারীম ﷺ দ্বীন বিষয়ে যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন ও যা করতে বারণ করেছেন, তার আনুগত্য করা ওয়াজিব। আর ইহা হল রাসূল ﷺ কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে সাক্ষও দেয়ার দাবির মধ্যকার। আল্লাহ তায়ালা অনেক আয়াতের মাঝে তাঁর রাসূলের ﷺ আনুগত্য করার মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন। কখনো আল্লাহর আনুগত্যের সাথে রাসূলের ﷺ আনুগত্যকে মিলিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন তাঁর কথায় বলা হয়েছেঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُوْلَ ﴾ (النساء:٥٩)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর। (সূরা নিসাঃ৫৯) এ ধরণের অনেক আয়াত আছে।

আর কখনো রাসূলের ﷺ আনুগত্য মর্মে পৃথক ভাবে আদেশ করেন।

﴿ مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ ﴾ (النساء:٨٠)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাসূলের (ﷺ) আনুগত্য করবে, সে যেন

আল্লাহর আনুগত্য করল (সূরা নিসাঃ৮০) এই মর্মে আরো একটি আয়াত-

﴿ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (النور: ٥٦)

অর্থাৎ তোমরা রাসূলের (ﷺ) আনুগত্য কর, তবে তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে। (সূরা নূরঃ৫৬)

আবার কখনো রাসূল ﷺ এর বিরোধিতাকারীদেরকে শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেনঃ

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (النور: ٦٣)

অত:পর যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরন করে তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে। অথবা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। (সূরা নূর:৬৩)

অর্থাৎ তাদের অন্তরে কুফরী অথবা নিফাক অথবা বিদআত স্পর্শ করবে। অথবা হত্যা শাস্তি কিংবা বন্দীদশা ও অন্যান্য তাৎক্ষণিক শাস্তি দ্বারা দুনিয়ায় শাস্তি প্রাপ্ত হবে। আল্লাহ তায়ালা তার রাসূল ﷺ এর অনুসরণ ও অনুকরণ কে বান্দার জন্য আল্লাহর ভালবাসা অর্জন ও তাঁর পাপ মোচনের মাধ্যম করেছেন আল্লাহ বলেনঃ

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (آل عمران: ٣١)

অর্থাৎ আপনি বলুন: যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর। যাতে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। (আল ইমরানঃ৩১)

তিনি (আল্লাহ) তাঁর (রাসূল ﷺ) এর অনুসরণকে হেদায়েত ও তাঁর নাফরমানীকে ভ্রষ্টতা হিসেবে গণ্য করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ (النور:٥٤)

অর্থাৎ যদি তোমরা তার অনুসরণ কর, তবে হেদায়েত পাবে। (সূরা নূরঃ৫৪)

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

(القصص: ٥٠)

অর্থাৎ তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবে তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হেদায়েতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। তার চাইতে অধিক পথ ভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। (সূরা কাসাসঃ৫০)

আল্লাহ তায়ালা জানিয়েছেন যে, তাঁর নাবী ﷺ এর জীবনের

মাঝে তাঁর উম্মতের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। তাই মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ (الأحزاب:٢١)

অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মধ্যে উত্তম আদর্শ নিহিত আছে। (সূরা আহযাবঃ২১)

ইবনে কাসীর (রহ:) رحمه الله বলেন এই গুরুত্বপূর্ণ আয়াতটি রাসূল ﷺ এর কথা, কাজ ও তাঁর অবস্থাবলীতে তাঁকে অনুসরনের একটি বড় মূল বস্তু। এ জন্য মহান বরকতময় আল্লাহ আহযাবের যুদ্ধের দিন নবী কারীম ﷺ কে অনুসরণ করার জন্য, সাহাবায়ে কিরামকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার ধৈর্য্যধারণে, পরস্পরকে ধৈর্য্য ধারণের নির্দেশে যুদ্ধের জন্য যোগাযোগ স্থাপন করার মধ্যে এবং আল্লাহর পথে কষ্ট সহ্য করতে ও তার রবের পক্ষ থেকে বিপদ মুক্তির অপেক্ষা করার মধ্যে, কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর প্রতি আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারীমে প্রায় চল্লিশ জায়গায় রাসূলের অনুসরণ ও অনুকরণ করার কথা উল্লেখ করেছেন। তাই আত্মার চাহিদা হল তিনি যা এনেছেন সে গুলোকে জানা ও অনুসরণ করা, খাদ্য খাওয়া ও পান করা বেশী গুরুত্ব সহকারে। খানা

খাওয়া ও পানীয় বস্তু পান করার ক্ষমতা অর্জন যখন শেষ হয়ে যায়, তখন দুনিয়ায় মৃত্যু ঘটে। আর রাসূলের অনুসরণ ও অনুকরণ করা যখন শেষ হয়ে যায়, তখন আযাব ও দূর্ভাগ্য স্থায়ীভাবে নেমে আসে। মহানবী ﷺ সমস্ত ইবাদতের মধ্যে তাঁর অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি যে পদ্ধতিতে উহা আদায় বা পালন করেছেন, সে পদ্ধতিতে আদায় করতে হবে। তাই নাবী ﷺ বলেন:

(صلوا كما رأيتموني أصلي)

অর্থাৎ তোমরা আমাকে যে ভাবে নামায আদায় করতে দেখ, সেভাবে আদায় কর। (বুখারী সংক্ষেপে) তিনি এও বলেছেনঃ

(خذوا عني مناسككم).

অর্থাৎ তোমরা আমার কাছ থেকে হজ্জের নিয়ম-কানুন জেনে নাও। (মুসলিম সংক্ষেপে) তাঁর আরেকটি বাণীঃ

(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد).

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন কাজ করল, যার উপর আমাদের কোন স্বীকৃতি নেই উহা প্রত্যাখ্যাত। (বুখারী, মুসলিম) তিনি নিম্নোক্ত বাণীতে বলেনঃ

(من رغب عن سنتي فليس مني).

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে উপেক্ষা করল, সে আমার

ত্বরিকার মধ্যেকার নয়। এ ছাড়াও অনেক দলীল আছে , যা দ্বারা তার অনুসরণ করতে আদেশ এবং তাঁর বিরোধিতা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল ﷺ এর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠের বিধিবদ্ধতাঃ

রাসূল ﷺ এর জন্য তাঁর উম্মতের প্রতি আল্লাহ তায়ালা যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা হল তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করা। মহান আল্লাহ তায়ালা
বলেন:

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (الأحزاب:٥٦)

অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর ফেরেস্তাগণ নাবী ﷺ এর উপর রহমত প্রেরণ করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাঁর উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর। (সূরা আহযাব ঃ ৫৬)

আবূল আলিয়াহ হতে বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তায়ালার নাবীর ﷺ প্রতি সালাতের অর্থ হল যে ফেরেস্তাদের নিকট তার প্রশংসা করা আর ফেরেস্তাদের সালাত পাঠের অর্থ হল যে, তাঁর জন্য দুয়া করা এবং মানুষের পক্ষ থেকে সালাত পাঠের অর্থ হল যে ক্ষমা প্রার্থনা করা। পবিত্র আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতের মাধ্যমে অবিহিত করেন

যে, তিনি তাঁর নিকট মর্যাদা সম্পন্ন ফেরেস্তাদের মাঝে তাঁর বান্দা ও রাসূলের ﷺ মর্যাদার কথা বর্ণনা করে প্রশংসা করেন। আর ফেরেস্তাগণ তাঁর জন্যে দুয়া করেন, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর বাসিন্দাদের প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করার নির্দেশ জারি করেন, যাতে করে উর্ধ্ব জগত ও নিম্নজগত উভয় জগতের বাসিন্দাদের প্রশংসা (কামনা) একই সঙ্গে হয়।

আর (سلموا تسليما) অর্থ হল , তোমরা তাকে ইসলামের অভিনন্দন দ্বারা অভিনন্দিত কর। যখন নাবীর ﷺ উপর দরূদ পাঠ করবে তখন দরূদ ও সালাম এক সাথে পাঠ করবে, কোন একটির উপর সংক্ষেপ করবেনা। সুতরাং সে যেন শুধু না বলে صلى الله عليه এবং এমনো না বলে عليه السلام কেননা আল্লাহ তায়ালা ঐ দুটুকে একত্রে পড়ার আদেশ দিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করার কথা বেশ কিছু জায়গায় তাকিদের সাথে হয় জরুরী, নতুবা মুসতাহাব হিসেবে আদায় করতে বলা হয়েছে।

আর ইবনুল কায়্যিম (রহ) তার রচিত জালাউল আফহাম নামক গ্রন্থে এক চল্লিশটি জায়গায় উল্লেখ করেছন, তিনি কথা শুরু করেছন, প্রথম স্থান বলে। আর উহা সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও তাকিদ পূর্ণ। নামাযের মাঝে শেষ তাশাহুদে এবং উহা প্রবর্তন হওয়া বিষয়ে সমস্ত আলিমগণ

একমত হয়েছেন, তবে তা নামাযের মধ্যে অপরিহার্য কি না তা নিয়ে মতভেদ করেছেন। (জালাউল আফহাম: ২২২-২২৩পৃঃ)

তার পর তিনি কুনুতের শেষের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন জুমআর খুৎবায়, দুই ঈদের খুৎবায় ও ইসতিসকার খুৎবায়, মুয়াযযিনের আযানের উত্তর দানের পরে, আর দুয়া করার সময় মসজিদে প্রবেশ ও উহা হতে বের হওয়ার সময় এবং নাবী কারীম ﷺ এর নাম উচ্চারনের সময়। তারপর তিনি (রহ) নাবী ﷺ এর প্রতি দরূদ পড়ার চল্লিশ টি উপকারিতা বর্ণনা করেছেনঃ (জালাউল আফহাম ৩০২পৃঃ)

তন্মধ্যে (১) এর দ্বারা মহান আল্লাহর আদেশ বাস্তাবয়ন করা। (২) একবার দরূদ পাঠ করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে ১০টি রহমত অর্জন। (৩) দুয়ার পূর্বে পাঠ করলে দুয়া কবূল হওয়ার আশা থাকে। (৪) নাবী ﷺ এর জন্য ওসীলা চাওয়ার সময় উহা পাঠ করলে রাসূলের ﷺ শাফাআতের একটি মাধ্যম হয়। (৫) সমস্ত পাপরাশি মার্জনা করার মাধ্যম। (৬) দরূদ ও তাসলিম পাঠকারীর উপর নাবী কারীম ﷺ এর পক্ষ থেকে উত্তর পাওয়ার মাধ্যম। নাবী কারীম ﷺ এর উপর সকল প্রকার দরূদ ও সালাম অর্পিত হোক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আহলে বাইত এর মর্যাদা বিষয়ে ও তাঁদের জন্য কম ও বাড়াবাড়ি ব্যতীত যা করনীয়ঃ

আহলে বাইত হলেন নাবী কারীম ﷺ এর পরিবারবর্গ, যাদের প্রতি সাদকা হারাম করা হয়েছিল। তাঁরা হলেন, হযরত আলী رضي الله عنه এর পরিবার, জা'ফর رضي الله عنه এর পরিবার, আকিল رضي الله عنه এর পরিবার, আব্বাসের رضي الله عنه পরিবার, হারিস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানাদী এবং নাবী কারীম ﷺ এর সহধর্মীনিগণ এবং তাঁর কন্যাগণ, আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি রাজী হোন।

এর প্রমান আল্লাহর বাণীঃ

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (الأحزاب: ٣٣)

অর্থাৎ আল্লাহ কেবল চান তোমাদের অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণ পুতঃপবিত্র রাখতে। (সূরা আহযাব-৩৩)

ইমাম ইবনু কাছির (রহ) বলেন, অতঃপর এ কথায় সন্দেহ করা যাবে না যে, কুরআনকে যে গবেষনা করবে, নিশ্চয় নাবী কারীম ﷺ এর পত্মিগণ তার আগত বাণীর অন্তর্ভুক্ত।

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (الأحزاب: ٣٣)

কেননা বর্ণনা ভংগি তাদের ব্যাপারেই সম্পৃক্ত। এ জন্য এ সমস্ত বর্ণনার পরে আল্লাহ বলেনঃ

﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ﴾(الأحزاب:٣٤)

অর্থাৎ আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞান গর্ভ কথা , যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তোমরা সেগুলো স্মরণ করবে। (সূরা আহযাব-৩৪) অর্থাৎ বরকতময় আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল ﷺ এর প্রতি যা অবতীর্ণ করেন, সেগুলো কুরআন হোক বা হাদীস হোক, তোমরা তোমাদের গৃহে জেনে নাও। হযরত কাতাদাহ رضي الله عنه ও একাধিক ব্যক্তি বলেছেন, তোমরা এ নেয়ামতকে স্বরণ কর। যা দ্বারা তোমরা সকল লোকের মাঝে বিশেষিত হয়েছ। নিশ্চয় ওহী সমস্ত লোককে বাদ দিয়ে কেবল তোমাদের গৃহে অবতীর্ণ হয়। কেননা হযরত আয়েশা رضي الله عنها ছাড়া অন্য পত্নির বিছানায় রাসূলের ﷺ উপর ওহী অবতীর্ণ হয়নি। যেমন উহার উপর নাবী ﷺ দলীল পেশ করেছেন। আর কতিপয় আলেম বলেছেন, কেননা নাবী কারীম ﷺ তাঁকে হযরত আয়েশা رضي الله عنها ছাড়া আর কোন কুমারী মহিলাকে বিয়ে করেননি। আর নাবী ﷺ ছাড়া তাঁর বিছানায় তাঁর সাথে কেউ শয়ন করেননি। তিনি বলতে চান যে, তিনি রাসূল ﷺ ছাড়া কাউকেও বিয়ে করেননি। তাই এই বৈশিষ্ট্যের সাথে খাস করা এবং এই উচ্চ সম্মানের দ্বারা তাঁকে আলাদা করা সঠিক হয়েছে। কিন্তু যখন তাঁর সমস্ত পত্নিগণ তাঁর ﷺ আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন,

তখন তাঁর নিকটাত্মীয়গণ এই নামের সাথে অধিক উপযুক্ত হবে। ইবনু কাছিরের ব্যাখ্যা এখানেই সমাপ্ত।

তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত রাসূলের ﷺ পরিবারবর্গকে ভালবাসেন এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাদের মর্মে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপদেশ সংরক্ষণ করে থাকেন, যেহেতু তিনি ﷺ গাদিরে খোমদিবসে (একটি জায়গার নাম) বলেছিলেনঃ

(أذكركم الله في أهل بيتي).

অর্থাৎ তোমাদেরকে আমার পরিবারবর্গের ক্ষেত্রে আল্লাহর কথা স্বরন করিয়ে দিচ্ছি(মুসলিম)

সুতরাং আহলুস সুন্নাহ তাদেরকে ভালবাসেন এবং সম্মান করেন কেননা উহা নাবী কারীম ﷺ এর মহাব্বতের এবং তাকে সম্মান করার অংশ বিশেষ। আর উহা এই শর্তে যে, তারা সুন্নাতের অনুসারী হবে এবং ইসলামী মিল্লাতের উপর অটল থাকবে। যেমন ভাবে পূর্বসূরীগণ উহার উপর অটল ছিল, যেমনঃ হযরত আব্বাস رضي الله عنه ও তদীয় পুত্রগণ, এবং হযরত আলী ও তদীয় পুত্রগণ رضي الله عنهم। আর যারা সুন্নাতের বিরোধিতা করবে এবং দ্বীনের উপর অটল থাকবে না, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও রাখা বৈধ নয়। যদিও তারা আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত হয়। অতএব, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত আহলে বাইতের ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী ও

ইনসাফকারী। তারা দ্বীনের ধারক ও দ্বীনের উপর অটলভাবে অবস্থান কারীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে । আর যারা সুন্নাতের বিরোধিতা করে এবং দ্বীন থেকে বিমোখ হয়ে যায়। তাদের সাথে তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে। যদিও তারা আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া ও রাসূলের ﷺ নিকট আত্মীয় হওয়া তাদের উপকারে আসবে না, যতক্ষণ না তারা, আল্লাহর দ্বীনের উপর অটল থাকবে। আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه বর্ণনা করেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর আগত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন তিনি দাড়ালেন

﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ (الشعراء: ٢١٤)

অর্থাৎ আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে ভয় দেখান। (সূরা শুআরা -২১৪)

অতঃপর তিনি বললেনঃ

(يا معشر قريش أو كلمة نحوها إشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاً يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً يا صفية عمة رسول الله ﷺ لا أغني عنك من الله شيئاً ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً) .

অর্থাৎ হে কুরাইশ বংশের লোকেরা অথবা এ ধরনেরই কোন কথা বলেন, তোমরা তোমাদের জীবনকে খরিদ করে নাও। (শিরকের পথ পরিত্যাগ করত: তাওহীদের

পথ অবলম্বন করার মাধ্যমে জাহান্নামের শাস্তি থেকে নিজেদেরকে বাচাও) আল্লাহর কাছে জাবাবদিহি করার ব্যাপারে আমি তোমাদের কোন উপকারে আসব না। হে আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব, আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে, আমি আপনার জন্য কোন উপকার করতে সক্ষম নই, হে রাসূলুলাহের ফুফু সাফিয়্যাহ, আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে আমি আপনার কোন উপকার করতে সক্ষম নই। হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা, আমার সম্পদ থেকে যা খুশি চাও। কিন্তু আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে, তোমার কোন উপকার করার ক্ষমতা আমার নেই। (বুখারী)

আরেক হাদীসে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

(من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)

অর্থাৎ যার আমল কমে গেল , তার বংশ এগিয়ে নিতে পারবে না। (মুসলিম)

এভাবে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের লোকেরা নিজেদেরকে রাফেযিদের নীতি থেকে মুক্ত রাখেন। রাফেযীরা আহলে বাইতের প্রতি সীমাতিরিক্ত ভক্তি প্রদর্শণ করে এবং তাদেরকে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত স্থানের আরো উপরে মর্যাদা প্রদান করে। এভাবে তারা নাসি'বীদের পন্থা থেকেও নিজেদেরকে মুক্ত রাখে। নাসি'বী ওরাই যারা সত্যের উপর

অটল আহলে বাইতের উপর শত্রুতা রাখে এবং তাদেরকে দোষারোপ করে। এবং বিদআতী ও খুরাফিদের পন্থা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছেন। যারা আহলে বাইতকে ওসীলা ধরে এবং আল্লাহ ব্যতীত তাদেরকে রব হিসেবে বিশ্বাস রাখে।

অতএব, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত এ বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে মধ্যম পন্থা ও সরল পথের পথিক। তারা এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি করে না, ঘাটতিও করেন না। আর আহলে বাইত ও অন্যান্যদের অধিকারের বিষয়ে কোন রকম বাড়াবাড়ি ও কম করেন না। আহলে সুন্নাত (যারা শীর্ষস্থানীয়) তাদের ব্যাপারে অতিরঞ্জনকারীদেরকে অস্বীকার করেন এবং তাদের থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখেন।

আমিরুল মোমিনীন আলী বিন আবি তালিব তাঁর মর্যাদার ব্যাপারে অতিরঞ্জনকারীদেরকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছেন। ইবনু আব্বাস ﵁ তাদেরকে হত্যার ব্যাপারে একমত পোষন করেন। তবে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে না মেরে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করার অভিমত পোষণ করেন। আলী ইবনু আবি তালিব ﵁ গুলাতদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে সাবাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে সন্ধান করেন, কিন্তু সে জানতে পেরে পালিয়ে যায়, ও আত্ম গোপন করে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সাহাবায়ে কেরামদের মর্যাদা ও তাদের ব্যাপারে কিরূপ ধারণা রাখা কর্তব্য এবং তাদের মধ্যে সংঘটিত বাদ-বিসংবাদ সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অবস্থান। সাহাবা বলতে কাদেরকে বুঝায় এবং তাদের মর্মে কতটুকু ধারণা বা বিশ্বাস রাখা একান্ত অপরিহার্য।

الصحابة শব্দের একবচন صحابي সাহাবী ঐ ব্যক্তিকে বুঝায়, যে নাবী কারীম ﷺ এর সাথে ঈমানের অবস্থায় যার সাক্ষাৎ ঘটেছে এবং উহার উপরেই মৃত্যুবরণ করেছেন। এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিজ্ঞানময় কিতাবের মাঝে তাদের প্রশংসা করতেগিয়ে বলেন:

﴿ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (التوبة: ١٠٠)

অর্থাৎ আর যারা সর্ব প্রথম হিজরতকারী ও আনছারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট, তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ। যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল

মহান কৃতকার্যতা। (সূরা তাওবা: ১০০)

আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রশংসা করতে গিয়ে আরো বলেনঃ

﴿ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (الفتح: ٢٩)

অর্থাৎ মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহনুভূতিশীল আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন। তাওরাতে তাদের অবস্থা এরূপ এবং ইঞ্জিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজুবত হয় এবং কাণ্ডের উপর দাড়ায় দৃঢ়ভাবে চাষীকে আনন্দে অভিবুত করে, যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর জ্বালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসস্থাপন করে এবং সৎকর্ম

করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরুস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন। (সূরা ফাতহ:২৯)

মহান আল্লাহ তাদের প্রশংসায় আরো বলেন:

﴿ لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (الحشر: ٨-٩)

অর্থাৎ এই ধন সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্য, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী। যারা মুহাজিরদের আগমণের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পন্য থেকে মুক্ত, তারা সফলকাম। (সূরা হাশরঃ৮-৯)

উল্লেখিত আয়াতে কারীমাসমূহে পবিত্র আল্লাহ মুহাজির ও আনসারগণের প্রশংসা করেছেন। আর তারা

বিভিন্ন কল্যাণের কাজে অগ্রগামী বলে তাদের তিনি বিশেষণ বর্ণনা করেছেন। আর তিনি (আল্লাহ) সংবাদ দিয়েছেন যে, তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন এবং তাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন, যে তারা তাদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর আর তাদেরকে অধিক রুকু সিজদাকারী এবং অন্তর বিশুদ্ধ গুণে ভুষিত করেছেন। আর তাদেরকে ঈমান ও আনুগত্যের চিহ্নে চেনা যায়। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে স্বীয় নাবীর সাহচার্যের জন্য বাছাই করে নিয়েছিলেন। যার দ্বারা তিনি তাঁর কাফের শত্রুদের অন্তর জ্বালা সৃষ্টি করতে পারেন। অনুরূপ ভাবে তিনি মুহাজিরদেরকে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যার্থে এবং তাঁর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষায় তাঁদের বাস্তভিটা ও সম্পদ ত্যাগের গুনের কথা বর্ণনা করেছেন এবং নিশ্চয় তাঁরা বাস্তবে তা রূপদানকারী। অনুরূপ ভাবে তিনি (মহান আল্লাহ) আনসারদের প্রশংসা করেন। কারণ তারা হিজরত কারীগণকে আশ্রয়দানকারী ও তাদের সাহায্যকারী এবং সঠিক ঈমানদার ছিলেন। আর তাদের গুন বর্ণনা করেছেন এই জন্য যে, তারা তাদের মুহাজির ভাইদের এমন ভালবেসে ছিলেন যে, নিজেদের জীবনের উপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন, তাদের দুঃখ- কষ্টের ভাগীদার হয়েছিলেন এবং তারা কার্পন্য মুক্ত ছিলেন। তারা ঐ সমস্ত গুণের কারণে সফলতায়

পৌছেন। তাদের এই সমস্ত কৃতিত্ব ছিল সাধারণ গুন ও মর্যাদা। আর তথায় বিশেষ বিশেষ কৃতিত্ব ও স্তর রয়েছে। এর ফলে একজন অপরজনের উপর মর্যাদার অধিকারী, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, আর উহা পূর্বে ইসলাম গ্রহণ ও আল্লাহর পথে জিহাদ এবং হিজরত করা অনুযায়ী। আর সাহাবাদের মাঝে সর্বোত্তম চার খলিফাঃ যথাক্রমে আবু বাক্কার সিদ্দীক ও উমর ফারুক, উসমান বিন আফফান, আলী ইবনু আবী তালিব ﷺ তাদের পর হলেন, বেহেস্তের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবী, তাদের মধ্যে এই চারজন ও ত্বলহা, যুবাইর, আব্দুর রহমান বিন আওফ, আবু উবায়দাহ বিন যাররাহ, সা'আদ ইবনু আবি ওয়াককাস ও সাঈদ ইবনু যায়েদ এবং মুহাজিরগণ আনসারগণের উপর মর্যাদা রাখেন এবং আহলে বদর ও আহলে রিজওয়ান মর্যাদা রাখেন। আর যারা মক্কা বিজয়ের পুর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, ও লড়াই করেছেন, তারা মক্কা বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণকারীদের চাইতে মর্যাদবান।

সাহাবায়ে কেরামগনের মাঝে যে ফিৎনা ফাসাদ ও লড়াই সংঘটিত হয়েছিল সে বিষয়ে আহলে সুন্নাহ ওয়ালা জামায়াতের বিশ্বাসঃ

ফিৎনার কারণ: ইয়াহুদীরা ইসলাম ও ইসলামের ধারকদের

বিরুদ্ধে ষরযন্ত্র করে। অত:পর তারা জঘন্য চক্রান্ত করে ইয়ামানের ইয়াহুদীদের মধ্যেকার আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা নামক ইয়াহুদী অন্তরে কুফরী গোপন রেখে মুখে ইসলাম প্রকাশ করে। অতঃপর এই ইয়াহুদী খোলাফায়ে রাশেদার তৃতীয় খলিফা উসমান বিন আফফান- আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তিনিও তাঁকে সন্তুষ্ট করেছেন- এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপবাদ ছড়াইতে থাকে, ফলে স্বল্প দৃষ্টি সম্পন্ন, দূর্বল ঈমান ও কলহ প্রিয় কিছু প্রতারক তার চারিপাশে ভীড় জমায় এবং ন্যায় পরায়ন শাসক উসমান ﵁ কে অন্যায়ভাবে হত্যার মাধ্যমে ষড়যন্ত্রের অবসান ঘটে এবং তাকে হত্যার সূত্রধরে মুসলমানদের মাঝে মতানৈক্য শুরু হয় এবং সেই ইয়াহুদী ও তার অনুসারীদের উত্তেজিত করার ফলে ফিৎনার আগুন জ্বলে উঠে এবং সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে যেসব মতানৈক্য, সংঘাত ও সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছে, তা তাদের ব্যাখ্যা ও ইজতেহাদের কারণে হয়েছে।

আক্বীদাহ ত্বহাবিয়ার ব্যাখ্যাকারী বলেন, রাফেজীয়াহ মতবাদের মৌলনীতি প্রনয়ন করে একমাত্র মুনাফিক যিন্দিক। তার উদ্দেশ্য হল দ্বীন ইসলামকে বাতিল করা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পবিত্র জীবনকে কলূষিত করা। যেমন আলেমগণ এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ বিন সাবা (ইয়াহুদী) যখন ইসলাম প্রকাশ করল তার ঘৃণ্য চক্রান্তের দ্বারা ইসলামকে নষ্ট

করার ইচ্ছা করল যেমন: বুলস নামক ইয়াহুদী দ্বীনে নাসারানিয়্যাহকে নষ্ট করেছিল। তার পর সে (আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা) দরবেশী জীবন যাপন প্রকাশ করল, অত:পর সে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করতে লাগল, যাতে সে উসমান ﷺ এর ফিৎনা ও হত্যার ব্যাপারে চেষ্টা চালাতে পারে, তারপর যখন সে কুফায় আগমন করল, তখন হযরত আলী ﷺ এর প্রশংসায় বাড়াবাড়ি প্রকাশ করতে লাগল এবং তাকে সাহায্য করার কথা প্রকাশ করল, যাতে সে ঐ প্রচারনার মাধ্যমে নিজের উদ্দেশ্যকে সফল করতে পারে। ঐ খবর হযরত আলী ﷺ এর নিকট পৌছে গেল। অত:পর তিনি তাকে হত্যা করার জন্য প্রত্যয় করলেন। তখন সে সেখান থেকে কারফিসে পলায়ন করল, তার কুকির্তির কথা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلما قتل عثمان ﷺ تفرقت القلوب وعظمت الكروب وظهرت الأشرار وذل الأخيار- وسعى في الفتنة من كان عاجزاً عنها وعجز عن الخير والصلاح من كان يحب إقامته فبايعوا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ﷺ وهو أحق الناس بالخلافة حينئذ وأفضل من بقي لكن كانت القلوب متفرقة ونار الفتنة متوقدة فلم تتفق الكلمة و لم تنتظم الجماعة و لم يتمكن الخليفة وخيار

الأمة من كل ما يريدونه من الخير ودخل في الفرقة والفتنة أقوام وكان ما كان.

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ:) বলেন, যখন হযরত উসমান ﷺ কে হত্যা করা হল, তখন মানুষের অন্তর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আর বিপদাপদ বড় কঠিন হয়ে দেখা দিল, ও নানান প্রকারের অকল্যাণকামীরা প্রকাশ পেল, আর সম্মানীতদেরকে লাঞ্ছিত করা হল। অপারগ ব্যক্তিরা ফিৎনায় জড়িয়ে ফেলতে সক্ষম হল। আর যারা কল্যাণ ও সংশোধন করতে চেয়েছিল, তারা অপারগ হল। ফলে আমীরুল মো'মেনীন আলী ইবনু আবী তালিব এর হাতে তারা বাইয়াত গ্রহণ করলেন। সে সময় যারা বেচে ছিলেন তাদের মাধ্যে তিনি ছিলেন সব চাইতে সম্মানী ও মর্যাদাবান এবং খেলাফতের উপযুক্ত। কিন্তু জনগণের অন্তর বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল, ফিৎনার আগুন ছিল প্রজ্জলিত। তাই এই মহৎ কাজে একমত হওয়া সম্ভব হয় নাই এবং একটি দল হিসেবে দলবদ্ধ হওয়াও সম্ভবপর হয়নি এবং খলিফা আলী ﷺ ও উম্মতের শীর্ষ স্থানীয় সাহাবারাও যারা কল্যাণ করতে চেয়েছিলেন, তারা তা করতে সক্ষম হননি। আর এই বিশৃংখলার ফিৎনার মাঝে বিভিন্ন জাতীও অংশ গ্রহণ করে, ফলে যা ঘটার তাই ঘটেছিল। (মাজমূউল ফাতাওয়া – ২৫খণ্ড ৩০৪-৩০৫ পৃষ্ঠা)

তিনি হযরত আলী ﷺ ও মুয়াবিয়া ﷺ লড়াইর ব্যাপারে সাহাবীরা একে অপরের লড়ায়ে জড়িয়ে পড়ার অজুহাত বা কারণ স্পষ্ট করতে গিয়ে আরও বলেছেন: মুয়াবিয়া ﷺ খেলাফতের দাবী করেন নাই , যখন আলী ﷺ এর সাথে লড়ায়ে লিপ্ত হন তখন তিনি খেলাফতের জন্য বাইয়াতও গ্রহণ করেননি। আর তিনি খলিফা হিসেবেও লড়াই করেননি এবং তিনি খলিফার উপযুক্ত বলে নিজকে মনে করেননি। মুয়াবিয়া ﷺকে যে ব্যক্তি এই মর্মে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তার নিকট তিনি উল্লেখিত কথা গুলোর স্বীকারুক্তি প্রদান করেছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া ﷺ ও তার সঙ্গীসাথীগণ এটা চাচ্ছিলেন না যে তারা প্রথমে হযরত আলী ﷺ এর সঙ্গী সাথীদের সাথে যুদ্ধ শুরু করবেন এবং তাদের উপরে প্রাধান্য বিস্তার লাভ করবেন। বরং হযরত আলী ﷺ ও তার সঙ্গীরা যখন লক্ষ্য করলেন যে, তার বাইয়াত গ্রহণ ও আনুগত্য গ্রহণ করা তাদের উপর অপরিহার্য কর্তব্য। কেননা মুসলমানদের খলিফা একাধিক হওয়া উচিৎ নয়। এ সময় তারা তার আনুগত্যের বাইরে এই মহান দায়িত্ব থেকে বাধা প্রদান করছে। এমতাবস্থায় তারা শক্তির অধিকারী তাই তিনি স্থির চিন্তা করলেন তাদের সাথে লড়াই করার , যতক্ষণ, না এই দায়িত্ব পালন করে, অতঃপর আনুগত্য অর্জিত হয় এবং একটি জামায়াত গঠিত হয়। অপর পক্ষে মুয়াবিয়া ﷺ ও তার

সঙ্গী সাথীরা বলেন নিশ্চয় উহা (আনুগত্য) তাদের উপর বর্তমানে ওয়াজিব নয়, এই কারণে তাদেরকে যদি হত্যা করা হয়, তবে তারা হবেন অত্যাচারিত, তাদের বক্তব্যঃ কেননা উসমান ﷺ কে অন্যায় ভাবে হত্যা করা হয়েছে, এতে সকল মুসলমান এক। আলী ﷺ এর ফৌজদের মাঝে এ সময় তারা ছিল বিজয়ী ও শক্তিধর, অতঃপর যখন আমরা বায়াত নেয়া থেকে বিরত থাকলাম, তখন আমাদের জুলুম করল এবং আমাদের উপর শত্রুতা করল। আর আলী ﷺ এর পক্ষে তাদেরকে (মুয়াবিয়া ও তার সঙ্গী সাথীদের) প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি, যেমনি ভাবে সম্ভব হয়নি উসমান ﷺ হতে প্রতিহত করা। এমতাবস্থায় আমাদের উপর কর্তব্য এমন একজন খলিফার বাইয়াত গ্রহণ করা, যিনি আমাদের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও ইনসাফ কায়েম করতে সক্ষম হবেন। আর সাহাবায়ে কেরামদের মাঝে যে মতবিরোধ ঘটেছিল এবং ফিৎনা চলতে থাকার ফলে কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। সে ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের রীতিনীতী দুটি পদ্ধতিতে সংক্ষিপ্ত করা হচ্ছে।

প্রথম পদ্ধতিতে: সাহাবাদের মাঝে যা ঘটেছিল সে ব্যাপারে তারা আলোচনা ও সমালোচনা হতে বিরত থাকেন। আর এই ব্যাপারে দোষত্রুটি খোজা থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখেছেন, কেননা তাদের বিশ্বাস এই ধরনের দুর্ঘটনায়

আলোচনা ও সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকাই শান্তির পথ। আর তাদের ব্যাপারে নিম্নোক্ত দোয়া করে থাকেন:

﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (الحشر: ١٠)

অর্থাৎ তারা বলে হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করো এবং ঈমানদারগণের বিরোদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা আপনি দয়ালু পরম করুনাময়। (আল হাশরঃ১০)

দ্বিতীয় বিষয়ঃ তাদের দোষক্রুটির ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনার উত্তর প্রদান আর ইহা নিম্নে বর্ণিত কারণ সমূহ।

প্রথম কারণঃ এ সমস্ত সংবাদের মাঝে কতগুলো মিথ্যা রয়েছে, সেগুলোকে তাদের শত্রুরা মিথ্যারোপ করেছে। তাদের (সাহাবাদের) সুনাম ক্ষুন্ন করার উদ্দেশ্যে।

দ্বিতীয় কারণঃ এ সমস্ত সংবাদের মাঝে এমন কিছু সংবাদ আছে, যাতে কিছু অতিরিক্ত করা হয়েছে ও কমানো হয়েছে। আর তার শুদ্ধতা থেকে অশুদ্ধতার দিকে ফিরানো হয়েছে, আর তাতে প্রবেশ করেছে মিথ্যা সংবাদ যা অতিরঞ্জিত যার দিকে কোন দৃষ্টিপাত করা যাবে না।

তৃতীয় কারণঃ যা কিছু সহীহ শুদ্ধ এসেছে, তার সংখ্যা স্বল্প, তাদের (সাহাবাদের) এই ব্যাপারে কৈফিয়াত রয়েছে,

কেননা হয়তবা তারা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে, এমন মুজতাহিদ যাদের কিছু কিছু বিষয়ে ভুলও হতে পারে। সুতরাং ইহা ইজতেহাদের ক্ষেত্রে, যদি মুজতাহিদ এ ক্ষেত্রে সঠিক বিষয়ে পৌঁছতে পারে, তবে তার দ্বিগুন সওয়াব রয়েছে। আর যদি ভুল হয়ে যায় তবে একটি সওয়াব পাবে এবং মুজতাহিদের ভুল মার্জনীয় এই মর্মে হাদীসে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

(إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد.)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ বলেছেন, যখন কোন বিচারক ইজতিহাদ করে সঠিক মত পেশ করে, তখন তার জন্য দুটি নেকী লেখা হয়। আর যখন ইজতিহাদে ভুল পেশ করে, তবে তার জন্য একটি নেকী লেখা হয়। (বুখারী, মুসলিম)

চতুর্থ কারণঃ তারা মানুষ তাই তাদের ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা ভুল হওয়া স্বাভাবিক, মানুষ হিসেবে তারা পাপ থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু তাদের মাঝে যা কিছু ঘটে থাকে তা মার্জনা করার কয়েকটি দিক রয়েছে। যেমনঃ

একঃ তা হতে প্রত্যাবর্তন করা, আর তাওবা সমস্ত পাপ মিটিয়ে দেয় যেমন এই মর্মে অনেক প্রমাণ এসেছে। নিশ্চয় তারা ছিলেন সৎকাজে অগ্রগামী এবং তাদের অনেক কৃতিত্ব ও মর্যাদা আছে, যা তাদের দ্বারা ঘটিত পাপকে মিটিয়ে

দেয়। যদি তাদের দ্বারা ঘটে থাকে, মহান আল্লাহ এই বিষয়ের অবতারনা করে বলেনঃ

﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ (هود: ١١٤

অর্থাৎ নিশ্চয় নেকীর কাজগুলি পাপসমূহকে দূর করে দেয়। (সূরা হুদঃ১১৪)

তিন: নিশ্চয় তাদের নেকী অন্যদের তুলনায় বহুগুনে বেশী করে দেয়া হয়। মর্যাদার দিক দিয়ে তাদের সমতুল্য কেউ নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বানীতে প্রমাণ তারা হলেন, সর্বোত্তম সোনালী যুগের মানুষ। তাদের কেউ যদি একমুদ, সমপরিমাণ (কল্যাণ পথে) ব্যয় করে, তবে অন্যদের কেউ ওহুদ পর্বত সমতুল্য স্বর্ণ ব্যয় করার চাইতে উত্তম। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাদেরকেও তিনি সন্তুষ্ট করেছেন।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহ) বলেনঃ সমস্ত আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত এবং দ্বীনের ঈমামগণ কোন সাহাবীকে পাপ মুক্ত হিসেবে গণ্য করেন না। পরিজন ও পূর্ব ইসলাম গ্রহণকারী ও অন্যদেরকেও না। বরং তাদের দ্বারা পাপ কার্য সম্পাদিত হওয়া সম্ভব তবে আল্লাহ তায়ালা তাওবা দ্বারা তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং মোচনকারী নেকীসমূহ দ্বারা তাদেরকে ক্ষমা করে

দেন কিংবা ইহা ছাড়াও অন্যান্য কারণে তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

﴿وَالَّذِي جَاء بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُم مَّا يَشَاءونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الزمر:٣٣-٣٥)

قال تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ﴾ (الأحقاف: ١٥-١٦)

অর্থাৎ যারা সত্য নিয়ে আগমন করেছে এবং সত্যকে মেনে নিয়েছে তারা হল আল্লাহ ভীরু। তাদের জন্য পালনকর্তার কাছে তাই রয়েছে, যা তারা চাইবে। এটা সৎকর্মীদের পুরুস্কার যাতে আল্লাহ তাদের মন্দ কর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের উত্তম কর্মের পুরুস্কার তাদেরকে দান করেন। (সূরা যুমারঃ ৩৩-৩৫)

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন, অবশেষে সে যখন শক্তি স্বামর্থের বয়সের চল্লিশ বছরে পৌছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এরূপ ভাগ্য দান কর,

যাতে আমি তোমার নেয়ামতের শুকুর করি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকাজ করি। আমার সন্তানদেরকে সৎ কর্মপরায়ণ কর, আমি তোমার প্রতি ত্বাওবা করলাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম। আমি এমন লোকদের সুকর্মগুলো কবূল করি এবং মন্দ কর্মগুলো মার্জনা করি। তারা জান্নাতীদের তালিকাভুক্ত। (সূরা আহক্বাফঃ১৫-১৬)

সাহাবাদের মাঝে ফিৎনা ফাসাদের সময়ে যে, মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল ও লড়াই সংঘটিত হয়েছিল, উহাকে আল্লাহর শত্রুরা তাদেরকে গালি দেয়ার কেন্দ্র বিন্দু বা মাধ্যম বানায় এবং তাদের নিজেদের কৃতিত্ব অর্জন করা এবং নিজেদের সম্মান অর্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে বর্তমান যুগের কিছু লেখক এই অসৎ পরিকল্পনা কারীর পরিকল্পনার উপর কথা বলছে। যা জানেনা সে ব্যাপারে কলম ধরছে বাড়াবাড়ি করছে, তারা রাসূল ﷺ এর সাহাবীদের জীবনী লেখতে গিয়ে নিজেদেরকে বিচারক হিসেবে উপস্থাপন করেছে। তারা তাদের কতককে সঠিক পন্থী বিবেচিত করছে আর কতককে দলীল প্রমাণ ছাড়াই ভুলকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছে বরং প্রাচ্যবিদ বিদ্বেষ পোষনকারীগণ ও তাদের দোষর- লেজুররা উদ্দেশ্য প্রণীত হয়ে যা বলে তারা এরই পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছে। এমন কি তারা কিছু উদীয়মান

মুসলিম সমাজে তাদের গৌরবোজ্জল ঐতিহ্যে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয় এবং তারা সালফে সালেহীনদের সম্পর্কেও সন্দেহ পোষণ করে, যারা ছিলেন সোনালীযুগসমূহের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব, যাতে করে তারা ইহার দ্বারা ইসলামের মাঝে দোষ ছড়াতে পারে। আর মুসলমানদের ঐক্যের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে, আর সালফে সালেহীনদের অনুসরণ ও আল্লাহ তায়ালার বাণীর উপর আমলের পরিবর্তে, এই উম্মতের শেষ যামানার লোকদের অন্তরে পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি করে। এই মর্মে আল্লাহর বানীঃ

﴿ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (الحشر: ١٠)

অর্থাৎ যারা তাদের পরে আগমন করেছে, তারা বলে যে হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাদেরকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরোদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা আপনি দয়ালু ও পরম করুনাময়। (সূরা হাশর:১০)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সাহাবায়ে কিরামগণ ও আইম্মায়ে দ্বীনকে গালি দেয়া নিষেধঃ

একঃ সাহাবায়ে কিরামদেরকে গালি দেয়া নিষেধ।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মৌলিক নীতিমালার মধ্যে একটি হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবীদের ব্যাপারে মর্যাদাহানীকর মন্তব্য করা থেকে নিজেদের অন্তর ও জিহ্বাকে মুক্ত রাখা। যেমন আল্লাহ তায়ালা তার ভাষায় এই মর্মে তাদের গুন বর্ণনা করেছেনঃ

﴿ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (الحشر: ١٠)

অর্থাৎ যারা তাদের পরে আগমন করেছে তারা বলে যে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাদেরকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরোদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি দয়ালু পরম করুনাময় (সূরা হাশর-১০)

আর সাহাবীদেরকে গালি না দেয়ার মর্মে রাসূল ﷺ এর বাণীর আনুগত্য করা ।

(لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.)

অর্থাৎ তোমরা আমার সাহাবীদের গালি দিওনা। শপথ সেই সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তোমাদের কেউ যদি ওহুদ পর্বত সমান স্বর্ণ ব্যয় করে তবে তাদের একমুদ (এক সা'য়ের এক চতুর্থাংশ) পরিমাণ ব্যয়ের সমতুল্য হবে না। আর অর্ধেক মুদ এর সমানও হবে না।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আরো একটি মৌলিক নীতি হচ্ছে, তারা নিজেদেরকে রাফেযীদের ও খারেজিদের নীতি থেকে মুক্ত রাখেন, যারা সাহাবায়ে কিরামগণকে গালি দেয় ও তাদের মর্মে কটৌক্তি উচ্চারণ করে। আর তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষন করে আর তাদের সমস্ত মর্যাদাকে অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশকে কাফের বলে, অপর পক্ষে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত সাহাবায়ে কিরামদের মর্যাদার বিষয়ে কিতাব ও সুন্নায় যা কিছু এসেছে, তা তারা স্বীকার করে, আর তারা ইহাও বিশ্বাস করে যে, তারা হলেন সোনালীযুগের সর্বোত্তম। যেমন নাবী কারীম ﷺ বলেছেন:

(خيركم قرني)

তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হল আমার যুগ। (বুখারী ও মুসলিম)

আর তিনি ﷺ যখন বর্ণনা করলেন, এই উম্মত তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে তার মাঝে একটি ব্যতীত সবাই জাহান্নামে যাবে। তারা (সাহাবারা) এই একটি ফিরকা

সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি উত্তর দিলেনঃ

(هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)

অর্থাৎ তারা হলেন ঐ সমস্ত লোক যারা সেই মত চলবে যেভাবে আজকে আমি ও আমার সাহাবীরা চলছি। (ইমাম আহমাদ ও অন্যান্যের বর্ণনা)

আবু যুরা'আহ বলেন, যিনি ইমাম মুসলিমের সবচেয়ে সম্মানীত উস্তাজঃ যখন তুমি কোন লোককে দেখবে যে, সে সাহাবায়ে কিরামদের কারো সম্মান খাট করে দেখছে তখন তুমি নিশ্চিত ভাবে জানবে যে, সে বড় কাফের জিন্দিক। উহা এ জন্য যে, কুরআন সত্য, রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্য, তিনি যা কিছু সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, তা সত্য। ঐ সমস্ত সত্য বস্তুগুলো আমাদের নিকট একমাত্র সাহাবায়ে কিরামগণ পৌছিয়েছেন। কাজেই যারা তাদের প্রতি দোষারোপ করবে, সে কেবল কুরআনুল কারীম ও সহীহ হাদীসকে বাতিল করার ইচ্ছা করবে। তাই তারাই জিন্দিক নামে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত। পথভ্রষ্টতার হুকুম লাগানো তাদের বেলায় সঠিক ও প্রযোজ্য বিবেচিত হবে। আল্লামা ইবনে হামাদান হোয়তুল মুবতাদীইন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যে ব্যক্তি বৈধ মনে করে সাহাবায়ে কিরামদেরকে গালি গালাজ ও তাদের মর্মে কটোক্তি করবে, তবে সে কুফুরী করল, আর যদি বৈধ মনে না করে, তাদেরকে গালি দেয় তাহলে সে ফাসেকী কাজ করল। অপর

একটি মত এসেছে তাকে সাধারণ ভাবে কাফের বলা যাবে। আর যে ব্যক্তি তাদেরকে ফাসেক বলবে অথবা তাদের ধর্মের পালনকে দোষারোপ করবে, কিংবা তাদেরকে কাফের বলবে, সে কাফের হয়ে গেল। (আক্বীদা সাফারিনীর ব্যাখ্যা – ২/৩৮৮-৩৮৯)

দুই: বর্তমান উম্মতের ওলামাদের মধ্যেকার আইম্মায়ে দ্বীনকে গালি দেয়া নিষিদ্ধঃ

সাহাবাদের সম্মান ও মর্যাদার পরই দ্বীনের তাবেঈ ঈমামগণ এবং তাদের অনুসারীগণের স্থান ও মর্যাদা যারা সোনালী যুগের। আর তাদের পরে যারা এসেছেন, ন্যায় ভাবে সাহাবাদের অনুকরণকারীগণের স্থান ও মর্যাদা। যেমন আল্লাহ তায়ালা তাদের মর্মে বলেছেনঃ

﴿ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ﴾ (التوبة: ١٠٠)

অর্থাৎ আর যারা সর্ব প্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন এবং যারা সুন্দরভাবে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। (সূরা ত্বাওবা ১০০)

এ থেকে জানা গেল যে, তাদের সম্মানের হানি করা ও তাদের গালি দেয়া বৈধ নয়, কেননা তারা হলেন দ্বীনের ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (النساء:١١٥)

অর্থাৎ যে কেউ রাসূলের ﷺ বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরোদ্ধে চলে। আমি তাকে ঐ দিকেই ফিরাব যেদিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্য স্থান। (সূরা নিসাঃ১১৫)

তাহাবিয়া গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার বলেন: আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ﷺ সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের পর প্রতিটি মুসলমানের উপর কর্তব্য হল, মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা। যে বিষয়ে কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে, যারা আম্বিয়ায়ে কিরামদের উত্তরাধীকারী। যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা দ্বীন ইসলামের নক্ষত্র করে সৃষ্টি করেছেন, তাদের দ্বারাই স্থল ও সাগরের অন্ধকারে পথ পাওয়া যায়। মুসলমানগণ তাদের হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়া ও জ্ঞানী হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। কেননা তারা রাসূল ﷺ উম্মাতের মধ্যে প্রতিনিধী এবং তাঁর মৃত সুন্নাতকে পুনর্জীবন দানকারী। অত:পর তাদের মধ্যে সেই কুরআন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং তাকে কেন্দ্র করেই তারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আর তাদের বিষয়ে কুরআন আলোচনা করেছে, আর কুরআন নিয়েই তারা আলোচনা করেছেন। তারা সকলে নিশ্চিত ভাবে

একমত যে, রাসূল ﷺ এর অনুকরণ করা অপরিহার্য কর্তব্য। তবে তাদের মধ্যে কারো কথা যখন পাওয়া যাবে তার বিপক্ষে সহীহ হাদীস এসেছে, তখন তারা সহীহ হাদীসকে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে কোন না কোন কৈফিয়ত রয়েছে।

ওজুহাতের মূল ভিত্তি তিন ধরণের

এক: একথা বিশ্বাস না করা যে, নাবী কারীম ﷺ ইহা বলেছেন।

দুই: একথা বিশ্বাস করা যে, তিনি ঐ কথার দ্বারা এই মাসআলার উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

তিন: এ কথা বিশ্বাস করা যে, ইহার হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

তাদের মর্যাদা আমাদের উপর রয়েছে। কারণ তাদের অগ্রবর্তিতার অবদান ও যা সহ রাসূল ﷺ প্রেরিত হয়েছিলেন তা আমাদের কাছে পৌছে দেয়া এবং দ্বীনের যা কিছু আমাদের কাছে অস্পষ্ট ছিল তা পুংখরূপে ব্যাখ্যা করে দেয়া ছিল তাদের দায়ীত্ব। তাই আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করেছেন।

﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (الحشر: ١٠)

অর্থাৎ তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের

ক্ষমা করুন, আর ঐ সব লোকদেরকে ক্ষমা করুন। যারা ঈমানে আমাদের চেয়ে অগ্রণী ছিল, আর যারা ঈমানদার তাদের জন্য আমাদের অন্তরে হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি করিও না। হে আমাদের প্রতিপালক আপনি পরম দয়ালু ও পরম করুনাময়। (সূরা হাশরঃ১০)

ওলামাদের মাঝে এজতেহাদী ভূলভ্রান্তি সংঘটিত হওয়ার কারণে তাদেরকে তাদের সম্মানের হানী করা, বিদআত পন্থীদের কাজ। আর দ্বীন ইসলামের মাঝে সন্দেহ সৃষ্টি করা এবং মুসলমানদের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করার জন্য উম্মতে মুহাম্মদীয়ার শত্রুদের প্রচারনার অন্তর্ভুক্ত। এ পার্থক্যের কারণে বর্তমান উম্মতের জনগণ সালাফে সালেহীনের অনেক দূরে অবস্থান করছে। আর উলামায়ে কিরাম ও যুবকদের মাঝে দলা-দলি ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে বাস্তবে তাই সংঘটিত হচ্ছে। এ কারণে প্রাথমিক জ্ঞান অন্বেষণ কারীরা যেন ঐ সমস্ত লোকদের থেকে সজাগ থাকে, যারা দ্বীন বিষয়ে জ্ঞানীদের সম্মানহানী করে আর ইসলামী ফিকহের মর্যাদা হানী করে। আর ইসলামী দীক্ষায়পশ্চাদবরণ করে, যার মাঝে সঠিকতা ও সত্যতা রয়েছে। বরং তারা যেন তা দ্বারা উপকার গ্রহণ করে, আর তারা যেন তাদের ওলামাদের সম্মান করে এবং উদ্দেশ্য প্রনোদিত ও পথ ভ্রষ্ট দাওয়াত দানকারীদের দ্বারা ধোকায় না পড়ে। আল্লাহ সহায় হোন।

চতুর্থ অধ্যায়

বিদআত

প্রথম পরিচ্ছেদঃ

বিদআতের পরিচয়- তার প্রকার ও বিধানসমূহঃ

এক: বিদআতের পরিচয়:

আরবী ভাষায় বিদআত শব্দটি بدع শব্দ হতে গৃহীত। আর ইহা পূর্ব দৃষ্টান্ত ব্যতীত উদ্ভাবন করাকে বলা হয়। এ কথার প্রমাণে রয়েছে আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণীঃ

﴿ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ (البقرة: ١١٧)

অর্থাৎ আসমান যমীনের সম্পুর্ণ নবোদ্ভাবনকারী নতুন সৃষ্টিকারী। (সূরা বাকারাঃ১১৭)
তার অর্থ এই যে এ দুটি পূর্ব দৃষ্টান্ত ছাড়াই আবিস্কৃত। আল্লাহ তায়ালার বাণী থেকে আরও একটি প্রমাণ:

﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنْ الرُّسُلِ ﴾ (الأحقاف:٩)

অর্থাৎ বল হে নাবী! আমি কোন অভিনব প্রেরিত ও নতুন কথার প্রচারক রাসূল হয়ে আসিনি। (সূরা আহক্কাফ: ৯) এখানে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি রিসালাতসহ আল্লাহর নিকট থেকে বান্দাদের নিকট ধর্ম প্রচারক হিসেবে এসেছে। আমি প্রথম নই, বরং আমার পূর্বে অনেক রাসূল এসেছেন। আর আরবদের কথায় আরও বলা হয়: অমুক লোক বিদয়াত

করেছে, তার অর্থ বুঝানো হয়: অমুক লোক নতুন পন্থার উদ্ভাবন করেছে, যা ইতি পূর্বে কারো দ্বারাই অনুসৃত হয়নি।

বিদয়াত দু ভাগে বিভক্ত:

১। অভ্যাসমূলক বিদআত: যেমন জীবনের ব্যবহারিক কাজে, কর্মে ও বৈষয়িক জীবন যাপনের জন্যে নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবন এবং নব আবিস্কৃত যন্ত্রপাতি নির্মাণ। এ ক্ষেত্রে নতুন পন্থা অবলম্বন করা বৈধ।

২। দ্বীনের মাঝে নতুন কিছু কাজ বা পন্থা সংযোজন করা। আর ইহা নিষিদ্ধ। কেননা শরীয়তের মৌলিক বিধি-বিধান অপরিবর্তনীয়। এতে কোন প্রকার সংযোজন - বিয়োজন চলে না। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে স্পষ্ট প্রমাণ:

(مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ) .

অর্থাৎ আমাদের এই ধর্মে যে কেউ নতুন কিছু জিনিস উদ্ভাবন করবে, তা প্রত্যাখ্যাত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য আরেকটি বর্ণনায় আছেঃ

(مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوْ رَدٌّ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে, যা আমাদের তরীক্বায় নেই , সে কাজ প্রত্যাখ্যাত হবে। (সহীহ মুসলিম)

দুইঃ বিদআতের প্রকারভেদঃ ইহা দ্বীনের ক্ষেত্রে দু প্রকারঃ

প্রথম প্রকারঃ আক্বীদা-বিশ্বাসগত, কথা বার্তায় বিদআতঃ

যেমন জাহমিয়্যাহ মু'তাযিলাহ, রাফিযাহ ও সমস্ত ভ্রান্ত দলের বিভিন্ন কথাবার্তা এবং তাদের আক্বীদা বিশ্বাস।

দ্বিতীয় প্রকার: ইবাদতসমূহে বিদআত। যেমন আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোন ইবাদত করা, যার বিধান তিনি দেননি। ইহা আবার কয়েক ভাগে বিভক্ত:

প্রথম প্রকার: যা মূল ইবাদতে হয়ে থাকে, তথা এমন ইবাদতের উদ্ভাবন করা, শরীয়তে যার কোন ভিত্তি নেই । যেমন শরীয়ত অসম্মত নামাযের উদ্ভাবন অথবা শরীয়ত অসম্মত সিয়াম উদ্ভাবন। কিংবা শরীয়ত অসম্মত বিভিন্ন ঈদ উৎসবের উদ্ভাবন করা। যেমন জন্মোৎসব ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার: শরীয়ত সম্মত ইবাদতে যা কিছু জিনিস করা হয়, যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কেউ যদি জোহর অথবা আসরের নামাযে পঞ্চম রাকআত অতিরিক্ত করে।

তৃতীয় প্রকার: শরীয়তের বিধান সম্মত ইবাদত পালনের পদ্ধতিতে যে বিদআত করা হয়, তা এমনভাবে পালন করা হয় যা শরীয়তের পদ্ধতির বহির্ভুত। আর উহা এভাবে যেমন: শরীয়তের বৈধ যিকর আযকার। গানের ঝংকারে সমবেত কণ্ঠে আদায় করা হয়। আরো যেমন, ইবাদত সমূহ পালনে নিজের উপর অতিরিক্ত কষ্ট দেওয়া, যা নাবী কারীম ﷺ এর সুন্নাত থেকে বেরিয়ে যায়।

চতুর্থ প্রকার: আর তা হল শরীয়তের বিধান সম্মত ইবাদত

পালনের জন্য সময় নির্ধারণ করা। শরীয়ত যার সময় নির্ধারণ করে দেয়নি। যেমন মধ্য শা'বান বা ১৫ই শা'বানের দিনকে সিয়াম পালনের জন্য ও তার রাতকে কিয়াম বা সালাত আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া। শরীয়তে রোযা পালন ও নামায আদায়ের ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। তবে কোন একটি সময়ের সাথে খাস করার জন্য দলীল হওয়া আবশ্যক।

তিন: দ্বীনের মাঝে সকল প্রকার বিদআত ও নব প্রবর্তনের বিধান।

রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রবর্তিত ধর্মের মধ্যে প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত বিদআতই নিষেধকৃত ও সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি। এ কথার প্রমাণে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণীঃ

(وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ)

অর্থাৎ তোমরা নিজেদেরকে দ্বীন ইসলামে নিত্য নবউদ্ভূত বিষয়াদী থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। কেননা ধর্মে প্রত্যেক নবউদ্ভাবিত জিনিসই বিদআত এবং সমস্ত বিদআতই চরম বিভ্রান্তির মূল। (আবু দাউদ, তিরমিজী - হাসান সহীহ)

রাসূল ﷺ আরও একটি হাদীসঃ

(مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ) .

অর্থাৎ যে লোক আমার এই জিনিসে (শরীয়তে) এমন জিনিস নতুন শামীল বা উদ্ভাবন করবে, যা মূলত এ জিনিসের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই প্রত্যাখ্যাত হবে। (বুখারী,মুসলিম)

অন্য এক বর্ণনায় এসেছেঃ

(مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) .

যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে যা আমাদের তরীকায় নেই সে কাজ প্রত্যাখ্যাত হবে। (মুসলিম)

এ হাদীসদ্বয় এই ইঙ্গিত বহন করে যে, দ্বীনের মাঝে নবসৃষ্ট সব কিছুই বিদআত। আর সমস্ত বিদআতই গোমরাহী ও প্রত্যাখ্যান যোগ্য। এর মানেই হল ইবাদাত ও আক্বীদাসমূহে নতুন উদ্ভাবন করা জিনিস নিষিদ্ধ ও হারাম। তবে এ হারামের মান বিদআতের প্রকারভেদে কম-বেশী হতে পারে। তাই বিদআতের মধ্যে কতিপয় বিদআত খোলাখুলিভাবে কুফর। যেমন কবরস্ত ব্যক্তিদের নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কবরের চার পার্শ্বে তাওয়াফ করা, তাকে উদ্দেশ্য করে মান্নত করা ও যবেহ করার মত কোন প্রাণী উপস্থিত করা। কবরস্থ ব্যক্তিকে আহবান করা এবং তাদের নিকট উদ্ধার প্রার্থনা করা। আর যেমন অতিরঞ্জনকারী জাহমিয়াহ ও মু'তাজিলাদের কথাবার্তা। আরও এমন কোন কোন বিদআত আছে যা খাটি শিরক ও তাওহীদ পরিপন্থী কাজের মাধ্যম। যেমন কবরের উপর ঘর নির্মাণ করা, ও তার নিকটে নামায আদায় করা এবং দুয়া করা।

আর এক প্রকার বিদআত হচ্ছে আক্বীদা বিশ্বাসে ফিসকের বিদআত। যেমন খারেজীয়া, কাদরীয়া ও

মুরযিয়াদের কথা-বার্তা ও আক্বীদা বিশ্বাসে বিদআত, যা শারয়ী দলীল প্রমাণের সুস্পষ্ট পরিপন্থী। এ ছাড়া আরও এমন কিছু বিদআত করা হয়, যা পাপ কাজের অন্তর্ভুক্ত, যেমন বৈরাগ্যবাদীদের বিদআত। ঘর সংসার আত্মীয় স্বজন, দেশ সমাজ ত্যাগ করে জন মানবহীন এলাকায় গিয়ে একাকীভাবে মহান আল্লাহর ইবাদাতে ধ্যান মগ্ন থাকা ও রৌদ্রে দাড়ানো অবস্থায় রোযা পালন করা এবং কামরিপুর তাড়না কর্তনের উদ্দেশ্যে লাইগেসন করা বা খাসী হওয়া ইত্যাদি। (ইমাম শাত্বেবীর আল ই'তিসাম – ২/৩৭পৃঃ দ্রঃ)

সতর্কীকরণঃ যে লোক বিদআতকে হাসানা ও সাইয়্যিয়া এই দুভাগে ভাগ করবে, সে ভুল করবে এবং নাবী ﷺ এর নিম্নোক্ত বানী

(كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ).

প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী এ বাণীটিকে উপেক্ষা করবে ও চরমভাবে তার বিরোধিতা করবে। কেননা রাসূল ﷺ বিদআতের ব্যাপারে স্পষ্ট ফায়সালা দিয়ে গেছেন যে, তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের মধ্যে বিদআতের কোনটাই (হাসানা) ভাল নয় বরং তার সমস্তটাই খারাপ গোমরাহী। আর এই লোক রাসূল ﷺ এর অমর বাণীর অসারতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে বলে। সব বিদআতেই গোমরাহী তা ঠিক নয়। বরং কোন কোন বিদআত ভালও আছে। রাসূলের ﷺ কথার বিপরিত ব্যাখ্যা

দানের মারাত্মক দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে?

হাফিয ইবনে রজব, তার রচিত (শারহুল আরবায়ীন) চল্লিশ হাদীসের ব্যাখ্যা নামক গ্রন্থে লিখেছেন:

(كُـلُّ بِدْعَـةٍ ضَلاَلَةٌ) ব্যাপক অর্থ বহণকারী বাক্য সমষ্টির এটি একটি এমন বাক্য যা থেকে কোন কথা, কোন আক্বীদা ও আমল বাদ নেই যে এ বাক্য থেকে বেরিয়ে যেতে পারে।

আর ইহা ধর্মের মৌলিক নীতিমালাসমূহের বৃহৎ মৌলনীতি এবং রাসূল ﷺ এর নিম্নোক্ত বাণীর সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন

(مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.)

অর্থাৎ আমাদের এই দ্বীনে যে কেউ নতুন কিছু জিনিস উদ্ভাবন করবে তা প্রত্যাখ্যাত হবে। সুতরাং যে কেউ কোন কাজ, আমল বা নতুন পন্থা, রীতিনীতি চালু করবে এবং তাকে দ্বীনের আমলের সাথে সম্পৃক্ত করবে, অথচ তার সপক্ষে প্রকৃত পক্ষে দ্বীনের কোন মূল প্রমাণ নেই যে শরীয়তের কাজ হিসেবে গণ্য করা যাবে, তাই গোমরাহী ও বিভ্রান্তির মূল। আর এ দ্বীন সম্পূর্ণ বিদআত মুক্ত। চাই এটি আক্বীদার বিষয় হোক, অথবা অন্য কোন কাজ কর্ম কিংবা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য কথাবার্তা হোক। (জামেউল উলূম – ২৩৩পৃঃ)

যারা বলে বিদআতে হাসানার অস্তিত্ব আছে, তাদের সপক্ষে একমাত্র দলীল তা হল, তারাবীহ্র নামায বিষয়ে

হযরত উমর ফারুক ﷺ এর কথা هذه البدعة نعمت এ বাক্যটির শাব্দিক অর্থঃ এটা একটি উত্তম বিদআত। তারা আরো বলে, কুরআন কারীমকে একটি কিতাব বা গ্রন্থ হিসেবে লিপিবদ্ধ করা, হাদীস লিখন ও তাকে সংকলন করার মত আরও জিনিস রয়েছে। যেগুলোকে নতুন উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ বিষয়ে পূর্বসূরীগণ কোন আপত্তি করেননি ও খারাপ বলেও মন্তব্য করেননি। এসব কথার প্রতি লক্ষ্য রেখে লেখক যে উত্তর দিয়েছেন আমরা তা অনুধাবন করার জন্য একটু মননিবেশ করি। তিনি বলেন: বিদআত পন্থীরা যে সব বিষয়গুলোকে নব উদ্ভাবিত আখ্যায়িত করেছে সে সব বিষয় মর্মে নি:সন্দেহে শরীয়তের পক্ষ থেকে যথেষ্ট দলীল প্রমাণ রয়েছে বিধায় এসব বিষয়গুলো নব আবিষ্কৃত নয়।

আর হযরত উমর ফারুক ﷺ এর কথা:

هَذِهِ الْبِدْعَةُ نِعْمَتِ এর শাব্দিক অর্থ: এটা একটা উত্তম বিদআত। একথা দ্বারা বিদআতে হাসানা প্রমাণিত হয় না। কেননা উমর ফারূকের ﷺ কথার অর্থ মোটেই তা নয় , যা মনে করা হয়েছে। এজন্যে যে হযরত উমর ﷺ জামাতের সাথে তারাবীর নামাযকে নিশ্চয়ই সেই অর্থে বিদআত বলেননি, যে অর্থে বিদআত সুন্নাতের বিপরীত। তা বলতেও পারেন না তিনি। তিনি ﷺ জামায়াতের সাথে তারাবী পড়াকে যে অর্থে বিদআত বলেছেন তা হলঃ বিদআতের শাব্দিক ও

আভিধানিক অর্থে। পরিভাষা হিসেবে নয়। সুতরাং শরীয়তে যে জিনিসের মূল ভিত্তি রয়েছে, তা শরীয়ত হিসেবেই গণ্য হবে। আর যখন শরীয়তের কোন বিষয়ে বলা হবে ইহা বিদআত তখন তাকে শব্দগত ও অভিধানগত বিদআত মনে করতে হবে। শরীয়তের পরিভাষায় নয়। কেননা শরীয়তের পরিভাষায় বিদআত ঐ জিনিস বা কাজকে বলা হয় শরীয়তে যার মর্মে কোন প্রমাণ নেই যে তাকে শরীয়তের কাজ হিসেবে গণ্য করা যাবে। আর কোরআনুল কারীমকে একটি গ্রন্থ হিসেবে লিপিবদ্ধ করার প্রমাণ শরীয়তে রয়েছে। কেননা নাবী কারীম ﷺ কোরআনের আয়াতকে লিখে রাখতে বলতেন কিন্তু তা বিভিন্ন জিনিসের উপর বিক্ষিপ্তভাবে লিখাছিল। এরপর সাহাবায়ে কিরামগণ - আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন- তাকে হেফাজত করার উদ্দেশ্যে একটি মাসহাফে একত্রিত করেন। আর যেমন তারাবীহর নামায নাবী কারীম ﷺ তাঁর সাহাবাদের নিয়ে কয়েক রাত পড়েছেন, পরিশেষে মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন, শুধু একটি কারণে, তা হল এভাবে জামায়াত বদ্ধ হয়ে তারাবীহর নামায পড়লে হয়ত তা সাহাবীদের উপর ফরজই করে দেয়া হতে পারে। আর সাহাবায়ে কিরামগণ رضي الله عنهم নিজেরা বিক্ষিপ্তভাবে তারাবীহর নামায পড়া চালু রাখেন। রাসূল ﷺ এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও চলতে থাকে। এইভাবে হযরত আবু বকর رضي الله عنه

খেলাফত কাল কেটে যায়। পরবর্তীতে হযরত উমর ফারূক ﷺ এর শাসন কালে তিনি সমস্ত সাহাবাকে তারাবীহর নামায পড়ার জন্য এক ইমামের পিছনে একত্রিত করেন। যেমনভাবে তারা নাবী ﷺ এর পিছনে তারাবীহ পড়ার জন্য একত্রিত হতেন। এ হিসেবে এটা দ্বীনের মধ্যে কোন বিদআত নয়। আর অনুরূপভাবে হাদীস লিখনে শরীয়তের দৃষ্টান্ত রয়েছে। নাবী কারীম ﷺ এর কাছে যখন হাদীস জানতে চাওয়া হয়েছিল। তখন তার কোন কোন সাহাবীকে কিছু কিছু হাদীস লিখে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। নাবী কারীম ﷺ এর যামানায় কোরআনের সাথে হাদীসের সংমিশ্রণ হওয়ার আশংকা ছিল তাই তখন ব্যাপকভাবে হাদীস লিখা নিষিদ্ধ ছিল। অতঃপর তার যখন মৃত্যু হল, তখন এই আশংকা নিরসন হয়ে গেল, কেননা কোরআন এ সময় পরিপূর্ণ হয়েছে। আর নাবী কারীম ﷺ এর মৃত্যুর পুর্বেই সাহাবীদের আয়ত্তে এসে গেছে। তখন মুসলমানেরা হাদীসকে হিফাযত করার নিমিত্তে সংকলন করেছেন, যেন পরবর্তীতে নষ্ট না হয়। তাই আল্লাহ তাদেরকে ইসলাম এবং মুসলমানদের কল্যাণ করার জন্য উত্তম বদলা দান করেন। যেহেতু তারা তাদের প্রভুর কিতাব ও তাদের নাবীর ﷺ সুন্নাতকে নষ্ট হওয়া থেকে এবং খেলতামাশা করীদের খেলা থেকে রক্ষা করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ

মুসলমানদের জীবদ্দশায় বিদআতের প্রকাশ আর তা প্রকাশের কারণসমূহঃ

একঃ মুসলমানদের জীবদ্দশায় বিদআতের প্রকাশ এবং তার অন্তর্ভূক্ত দুটি মাসআলাহ।

প্রথম মাসআলাহঃ বিদআত প্রকাশের সময়কালঃ

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহ) বলেন। (মাজমূউল ফাতাওয়া– ১০/৩৫৪পৃঃ)

সম্মানিত পাঠকগণ জেনে রাখুন, নিশ্চয় জ্ঞান ও ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত বিদআতসমূহ একমাত্র বর্তমানে উম্মতের খোলাফায়ে রাশেদীনের সর্বশেষ সময়ে সংঘটিত হয়েছে।

যেমনিভাবে নাবী কারীম ﷺ সংবাদ দিয়েছেনঃ যেহেতু তিনি এরশাদ করেছেনঃ

(مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اِخْتِلاَفاً كَثِيْراً فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ) .

যদি কেউ তোমাদের মধ্যে বেশী দিন বাঁচে তবে সে নানা রকম মতবিরোধ দেখবে। তখন তোমাদের উপর অবশ্য কর্তব্য এই যে আমার সুন্নাতকে ও হেদায়াত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নাতসমূহকে শক্তভাবে আকড়ে ধরবে। (আবু দাউদ, তিরমিজী)

আর সর্ব প্রথম বিদআতের প্রকাশ ঘটেছে, কাদরিয়্যাহ, মুরজিয়্যাহ শিয়া ও খারেজিয়াদের বিদআত। আর উসমান ﵁ এর হত্যার পরে যখন দলাদলি ও মত দ্বন্দ শুরু হল, তখন হারুরিয়াদের বিদআতের প্রকাশ ঘটল। তারপর সাহাবায়ে কিরামদের সর্বশেষ যুগেই ইবনে উমর ﵁ ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও জাবের এবং তাদের সমমানের সাহাবায়ে কিরামদের শেষ যুগে কাদরিয়্যাহ মতবাদ শুরু হয়। মুরজিয়া মতবাদ শুরু হয়, এ সময়ের কাছাকাছি। আর জাহমিয়াদের মতবাদ শুরু হয় তাবেয়ীদের সর্বশেষ যুগে খলিফা উমর বিন আব্দুল আযীযের মৃত্যুর পর। বর্ণিত আছে তিনি তাদেরকে (জাহমিয়াদেরকে) সতর্ক করে দিয়েছিলেন। আর জাহমিয়াদের প্রকাশ ঘটেছিল খোরাসানে হিশাম বিন আব্দুল মালেক এর শাসন কালে।

এ সমস্ত বিদআত এর প্রকাশ হিজরীর দ্বিতীয় শতাব্দীতে ঘটে। তৎকালীন সময়ে সাহাবায়ে কিরামগণ বিদ্যমান ছিলেন। আর তারা বিদআত পন্থীদেরকে কড়াভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারপর প্রকাশ ঘটেছে মুতাযিলাদের বিদআতী মতবাদের, এবং মুসলামানদের মাঝে নানা ধরণের ফিৎনা শুরু হয় ও বিভিন্ন মতদন্দ প্রকাশ পায় এবং বিদআত ও প্রবৃত্তির দিকে ঝুকে পড়ে। আর সোনালী যুগের পর শুরু হয় তাসাউফ ও কবরের উপর ঘর নির্মাণ করার মত

বিদআত। এভাবে সময় যত গড়িয়ে যায় বিদআত বৃদ্ধি পায় এবং নানারূপ ধারণ করে।

দ্বিতীয় মাসআলাহ: বিদআত প্রকাশের স্থান

বিভিন্ন ইসলামী দেশে নানান প্রকারের বিদআতের প্রকাশ পায়। শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন: যেসব বড় বড় শহরে আল্লাহর নাবীর সাহাবায়ে কিরামগণ বসবাস করতেন এবং সেখান থেকে প্রচার হয়েছিল ধর্মীয় জ্ঞান ও ঈমান। তার সংখ্যা পাচটিঃ মক্কা-মদীনা, কুফা-বসরা এবং শাম। এ সমস্ত দেশ থেকে প্রচার হয়েছে কোরআন হাদীস, ফিকহ ও ইবাদাত এবং এর সাথে সম্পৃক্ত ইসলামের বিষয়সমূহ। আর মদীনা মুনাওয়ারা ব্যতীত এসব শহর থেকেই মৌলিক বিদআতসমূহ ছড়িয়েছে। যেমন কুফা শহর সেখান থেকে বের হয়েছে শিয়াহ ও মুরযিয়াহ মতবাদ। এরপর তা অন্যান্য শহরে বিস্তার লাভ করেছে। আর বসরা শহর থেকে ব্যাপকতা লাভ করে। আর শাম দেশ থেকে নাসীবিন ও কাদরিয়্যাদের বিদআত। আর জাহমিয়া মতবাদ শুরু হয় খুরাসানের এক প্রান্ত থেকে, এটা সবচেয়ে জঘন্য বিদআত। আর এসব বিদআতের প্রকাশ ঘটেছিল নাবী কারীম ﷺ এর আবাস ভূমি থেকে দুরত্ব হিসেবে। অত:পর হযরত উসমান رضي الله عنه এর হত্যার পর শুরু হয়, দলাদলি মত-বিরোধ তখন শুরু হয় হারুরিয়াদের বিদআত। কিন্তু নাবীর

শহর মদীনামুনাওয়ারা এসব বিদআত হতে মুক্ত থাকে। যদিও সেখানে এ বিষয়কে গোপনে পোষণকারী ছিল, তবে সে ছিল তাদের কাছে লাঞ্চিত অপমানিত। কেননা সেখানে ছিল কাদরিয়া ও অন্যান্য মতবাদের কিছু লোক। কিন্তু তারা ছিল চাপের মুখে লাঞ্চিত ও অপমানিত, কুফায় বসবাসকারী শিয়াহ ও মুরযিয়াদের বিপরীত অর্থাৎ তারা ছিল অনেকটা স্বাধীন। আর মুতাযিলাহ ও বিকৃত হজ্জের বিদআতকারী অর্থাৎ কবরের পার্শ্বে হজ্জের নিয়ম নীতি পালনকারীগণ বসরা শহরে অবস্থান করত। আর নাসীবিনরা শাম দেশে স্বাধীনভাবে চলত। নাবী কারীম ﷺ থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত আছে:

(إن الدجال لا يدخلها) .

নিশ্চয় দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। আর ইমাম মালিকের অনুসারীদের যুগ পর্যন্ত ইলম ও ঈমান বিদ্যমান ছিল। আর তারা ছিলেন চতুর্থ শতাব্দীর লোক। (মাজমূউল ফাতাওয়া –২০/৩০০-৩০০৩পৃঃ)

কিন্তু উত্তম যুগের তিন শতাব্দী পর্যন্ত নবীজীর শহরে প্রকাশ্যভাবে কোন বিদআত ছিল না এবং সেখান থেকে দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে কোন বিদআত এর প্রকাশ ঘটেনি। যেমনটি অন্যান্য শহর থেকে তা প্রকাশ পেয়েছিল।

দুই: বিদআত প্রকাশের কারণসমূহ: এতে কোন সন্দেহ নেই যে বিদআতে নিপতিত হওয়া এবং গোমরাহী ও

বিভ্রান্তি থেকে বাচার একটি মাত্র পথ, তা হল কিতাব ও সুন্নাতকে মুজবুতভাবে আকড়ে ধরা। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِه ﴾ (الأنعام: ١٠٣)

অর্থ: নিশ্চয় এটি আমার পথ। অতএব এপথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তাহলে সে সব পথ তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। (সূরা আনআমঃ১০৩)

এ বিষয়টিকে নাবী কারীম ﷺ স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ বর্ণনা করেছেন তিনি এভাবে বলেনঃ

خط لنا رسول الله ﷺ خطاً فقال:هذا سبيل الله ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله ثم قال: وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِه ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

অর্থাৎ আমাদের উদ্দেশ্যে নাবী ﷺ একটি রেখা টানলেন। তারপর বললেন: এটা আল্লাহ পাকের সোজা ও সঠিক পথ। তারপর তার ডানে এবং বামে আরও কিছু রেখা টানলেন,, তারপর বললেন এগুলো অন্য পথ যাদের প্রত্যেকটার শুরুতে শয়তান বসে মানুষদেরকে তার দিকে ডাকছে। তারপর কোরআন কারীম থেকে পড়লেন অবশ্যই

এটা আমার সরল সঠিক পথ, তোমরা অবশ্যই এর অনুসরণ করবে এবং অন্যান্য রাস্তাসমূহকে অনুসরণ করবে না, তাহলে এ রাস্তাসমূহ তোমাদেরকে তার রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। আল্লাহ পাক এভাবে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার। (আহমদ, ইবনে হিব্বান, হাকিম ও অন্যান্য)

অতএব যে ব্যক্তি কোরআন ও হাদীসকে উপেক্ষা করবে, তাকে সরিয়ে দিবে (সঠিক পথ থেকে) বিভ্রান্তীর পথসমূহ ও নব আবিষ্কৃত বিদআত। সুতরাং যেসব কারণসমূহ বিদআত প্রকাশে সহায়ক হয়েছে, তা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলঃ

দ্বীনের বিধি-বিধানে অজ্ঞতা, প্রবৃত্তির অনুসরণ করা। বিভিন্ন অভিমত ও বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষের অন্ধভাবে পক্ষ অবলম্বন করা, কাফিরদের অনুসরণ ও তাদের তাক্বলীদ করা। উপরে উল্লেখিত কারণসমূহ এখানে আমরা সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করছিঃ

(ক) দ্বীনের বিধি-বিধানে অজ্ঞতা: তা এই যে, সময় যত গড়িয়ে যায়, আর লোকেরা রিসালাতের শিক্ষা, আমল, আখলাক থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। ধর্মীয় জ্ঞানের আলো ততো লোপ পায় এবং অজ্ঞতার প্রসার ঘটে। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ মর্মে তাঁর বাণীতে বলেছেন:

(من يعش منكم فسيرى إختلافاً كثيراً) .

অর্থাৎ যদি কেউ তোমাদের মধ্যে বেশী দিন বাচে, তবে সে নানারকম মতবিরোধ দেখতে পারবে। (আবু দাউদ, তিরমিজী)

নাবী কারীম ﷺ এই মর্মে আরো বলেছেন:

(إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً إتخذ الناس رؤساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا).

অর্থাৎ (শেষ যামানায়) আল্লাহ তায়ালা ইলমে দ্বীন উঠিয়ে নিবেন না তার বান্দাদের (অন্তর) হতে টেনে বাহির করে। বরং আলিমদের উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ধর্মীয় ইলম উঠিয়ে নিবেন। অবশেষে যখন তিনি কোন আলিমকে বাকী রাখবেন না, তখন লোকেরা অজ্ঞ জাহিলদের নেতা রূপে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদের নিকট (মাসআলা- মাসায়েল) জিজ্ঞাসা করা হবে। আর তারা বিনা ইলমেই ফতোয়া দিবে, ফলে নিজেরাও বিভ্রান্ত হবে এবং অপরকেও বিভ্রান্ত করবে। (বুখারী, মুসলিম)

অতএব ইলম ও উলামা ব্যতীত বিদআতকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। অতঃপর যখন দ্বীনের ইলম ও আলিমগণ বিদায় নিবে, তখন বিদআতের প্রকাশ ও বিস্তার

লাভের সুযোগ আসবে, আর বিদআত পন্থীদের বিদআত কাজে তৎপর হওয়ার সুযোগ আসবে।

(খ) প্রবৃত্তির অনুসরণ করা: তা হল, যে ব্যক্তি কিতাব ও সুন্নাহর উপর আমল করা থেকে নিজেকে বিরত রাখল। সে তার প্রবৃত্তির আনুগত্য করল। একথার প্রমাণে আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণী:

﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ﴾ (القصص: ٥٠)

অত:পর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হিদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? (সূরা কাসাস:৫০)

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ ﴾(الجاثية: ٢٣)

অর্থাৎ আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন যে তার খেয়াল খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জ্ঞান থাকা সেত্বও তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মহর এটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব আল্লাহর পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে। (সূরা জাসিয়া:২৩)

আর বিদআত হল অনুসৃত প্রবৃত্তির সাজানো জাল।

(গ) বিভিন্ন অভিমত ও বিভিন্ন লোকের অন্ধভাবে পক্ষ অবলম্বন করা:

তা হল, নানান মত ও লোকের পক্ষাবলম্বনই হচ্ছে ব্যক্তির মাঝে এবং সঠিক দলীলের ও প্রকৃত সত্যকে জানার মাঝে একমাত্র অন্তরায়। মহান আল্লাহ এ কথার অবতারনা করে বলেনঃ

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا﴾

(البقرة: ١٧٠)

অর্থাৎ আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে হুকুমেরই আনুগত্য কর যা- আল্লাহ তায়ালা অবতীর্ণ করেছেন, তখন তারা বলে কখনো না, আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব, যাতে আমরা আমাদের বাপ দাদাদেরকে দেখেছি। (সূরা বাকারা: ১৭০)

এতো হল বিভিন্ন সূফীবাদী মাযহাব ও কবর পন্থীদের বর্তমান হাল অবস্থা। যখন তাদেরকে বলা হয় কিতাব ও সুন্নাহ উপর আমলের দিকে ফিরে আসতে এবং তারা যে কোরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী বিষয়ের উপর আছে তা পরিহার করতে, তখন তারা আপন মাযহাব ও তাদের মুরব্বীদের এবং বাপ দাদাদের মতাদর্শের উপর চলে আসা সাক্ষ প্রমান উপস্থাপন করে।

(ঘ) কাফিরদের অনুকরণ করা: এ এমন এক ক্ষতিকর বিষয়, বিদআত যা ক্ষতি করে, তার চেয়ে মারাত্মক ক্ষতিকর বিষয়। যেমন আবু ওয়াকিদ আল লাইসির হাদীসে বর্ণিত, তিনি বলেন:

خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله ﷺ: الله أكبر، إنها السنن: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿ اجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ (الأعراف:١٣٨) لتركبن سنن من قبلكم .

অর্থাৎ আমরা হুনাইন যুদ্ধের পূর্বে একদা রাসূলের ﷺ সাথে হুনাইনের পথে বের হলাম, তখন আমরা কুফরী ছেড়ে সবে মাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছি। সে সময় মুশরিকদের জন্য একটি বরই বৃক্ষ নির্দিষ্ট ছিল। এটাকে যাতু আনওয়াত বা ঝুলানোর উপযোগী বৃক্ষ বলা হত। মুশরিকরা এর পার্শে অবস্থান করত। এর সাথে তাদের যুদ্ধাস্ত্র ও আসবাবপত্র (বরকত লাভের জন্য) ঝুলিয়ে রাখত। আমরা সেই বৃক্ষের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম। অতঃপর আমরা

বললাম হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! তাদের মত আমাদের জন্যও একটি ঝুলানো উপযোগী বৃক্ষ করে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আশ্চার্য হয়ে বললেনঃ

الله أكبر আল্লাহ মহান নিশ্চয় ইহা একটি তরীক্বা তোমরা এমন কথা বলছো যার হাতের মুঠোয় আমান প্রাণ। যেমন বাণী ইসরাঈল মুসা عليه السلام কে বলেছিল: আমাদের জন্য ইলাহ নির্দিষ্ট করে দিন যেমন তাদের ইলাহসমূহ রয়েছে। (আল আরাফ:১৩৮) তিনি বললেন নিশ্চয় তোমরা অজ্ঞ জাতী। তিনি আরো বললেন, তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি আকড়ে ধরবে। (তিরমিজী বর্ণনা করে একে বিশুদ্ধ বলেছেন)

এই হাদীসের বর্ণনায় কাফিরদের সাদৃশ্য সর্ব প্রথম বাণী ইসরাঈলরা অনুকরণ করার আবেদন করেছিল। তেমণি ভাবে কাফিরদের সাদৃশ্য অবলম্বনে এই জঘন্য আবেদনটি মুহাম্মাদ ﷺ এর কিছু সাহাবীরা করেছিলেন যে, তাদের জন্য একটি বৃক্ষ নির্ধারণ করা হোক। আল্লাহ ব্যতীত তারা তা থেকে বরকত হাসিল করতে পারে। বর্তমানের আমলী প্রেক্ষাপটে ঠিক তাই। কেননা মুসলমানদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক শিরক ও বিদআত কাজ কর্মে কাফিরদের তাক্বলীদ বা অনুকরণ করছে: যেমন জন্মোৎসব পালন। নির্দিষ্ট কাজের উদ্দেশ্যে কিছু কাল ও সপ্তাহ উদযাপন করা, ধর্মীয় কাজ

উপলক্ষে ও ব্যক্তি বর্গের স্মরণে সমাবেশ করা, প্রতিকৃতি তৈরী ও স্মরনীয় মূর্তি দাড় করা, মাতম করা ও জানাযার নতুন পন্থা উদভাবন করা এবং কবরের উপর ঘর নির্মান করা ইত্যাদি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিদআত পন্থীদের বিষয়ে ইসলামী উম্মাহর অবস্থান এবং তাদের প্রতিরোধে আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের অনুসৃত পদ্ধতি।

একঃ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত বিদআত কারীদের প্রতিবাদ প্রতিরোধ করে এবং তারা তাদের বিদআত প্রত্যাখ্যান করে। আর তাদেরকে বিদআতের কর্মকাণ্ড হতে বাধা প্রদান করে। এই ব্যাপারে আপনার সামনে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলঃ

عن أم الدرداء قالت: دخل علي أبو الدرداء مغضباً فقلت له: مالك؟ فقال والله ما أعرف فيهم شيئاً من أمر محمد إلا أنهم يصلون جميعاً.

অর্থাৎ উম্মে দারদা ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আবু দারদা ﷺ (তার স্বামী) রাগান্বিত হয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি তাকে বললাম আপনার কি হয়েছে, তিনি উত্তর দিলেন, তাদের মধ্যে মুহাম্মাদ ﷺ এর রেখে যাওয়া কিছুই দেখি না। তাবে হ্যাঁ তারা সকলেই জামাত সহকারে

সালাত আদায় করে। (ইমাম বুখারীর বর্ণনা)

عن عمر بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبدالله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري، فقال : أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعاً فقال: يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد أنفاً أمراً أنكرته، و لم أر والحمد لله إلا خيراً قال: وما هو؟ قال إن عشت فستراه، قال رأيت في المسجد قوماً حلقاً جلوساً ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل، وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مائة، فيكبرون مائة فيقول هللوا مائة فيهللون مائة فيقول سبحوا مائة، فيسبحون مائة قال: فماذا قلت لهم؟ فقال: ما قلت لهم شيئاً انتظار رأيك، أو إنتظار أمرك، قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليها فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن من أن لايضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء أصحابه متوافرون وهذه ثيابه لم تبل، وأنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة قالوا : والله

يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال: وكم مريد للخير لن يصيبه إن رسول الله ﷺ حدثنا أن قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وأيم الله لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم، فقال: عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج.

অর্থাৎ আমর ইবনে ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমরা নামাযের পূর্বে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ এর দরজার সামনে উপবিষ্ট হতাম, যখন তিনি বের হতেন, আমরাও তাঁর সাথে মসজিদে যেতাম। একদিন আবু মুসা আল আশআরী ﷺবললেন, আবু আব্দুর রহমান কি বের হয়ে গেছেন? আমরা বললাম না। তখন তিনি আমাদের সাথে বসলেন তারপর যখন তিনি বের হলেন, তখন তিনি বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান! আমি মসজিদে এমন একটি কর্ম দেখেছি যা আমার অত্যান্ত ঘৃণা লেগেছে। কিন্তু আলহামদু লিল্লাহ ভাল উদ্দেশ্যই দেখলাম। তিনি বললেন কি দেখেছ? তিনি বললেন আপনি গেলে দেখতে পারতেন। তখন তিনি বললেন, আমি একদল লোককে মসজিদে গোল হয়ে বসে নামাযের অপেক্ষায় দেখতে পেলাম, প্রত্যেক সমবেত লোকদের হাতে কংকর রয়েছে এবং এক লোক তাদের উদ্দেশ্যে বলছে ১০০ বার তাকবীর পাঠ করুন তখন তারা ১০০বার তাকবীর পাঠ

করছে, তারপর বলছে ১০০বার তাহলীল পাঠ করুন, তখন তারা ১০০বার তাহলীল পাঠ করছে, এরপর বলছে ১০০বার তাসবীহ পাঠ করুন তারা ১০০বার তাসবীহ পাঠ করছে। তখন তিনি বললেন, তুমি তাদেরকে কি বললে? তিনি বললেন আমি কিছুই বলি নাই। আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আছি। তিনি বললেন তুমি তাদেরকে কেন বললে না তারা যেন তাদের পাপের হিসেব করে, আর তুমি এ জামিন নিবে তাদের ভাল কাজগুলি কখনও বিনষ্ট হবে না। তারপর তিনি সে সমাবেশের স্থানে এসে বললেন, এটা কি হচ্ছে? তখন তারা বলল কংকর দিয়ে আমরা তাকবীর, তাহলীল এবং তাসবীহ পাঠ করছি। তখন তিনি বললেন গুনাহের হিসাব কর, আমি জামিন নিচ্ছি তোমাদের ভাল কাজগুলি কখনও বিনষ্ট হবে না। কি হল হে উম্মাতে মুহাম্মাদ! তোমাদের ধ্বংস অতি নিকটবর্তী। নাবী ﷺ এর এই সাহাবাগণ এখনও তোমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন, তার কাপড় এখনও নষ্ট হয়নি, তার পানের পাত্রগুলি এখনও ভেঙ্গে যায়নি। শপথ সে আল্লাহর যার হাতে আমার জীবন, হয় তোমাদের এ ধর্ম মুহাম্মাদ ﷺ এর ধর্মের চেয়ে অধিকতর শ্রেষ্ঠ অথবা তোমরা পথ ভ্রষ্টতা দরজাকে উন্মোক্ত করেছ। তখন তারা বলল, আল্লাহর কসম হে আবু আব্দুর রহমান! আমাদের উদ্দেশ্য ভাল। তখন তিনি বললেন, কত লোক ভাল কাজ করার ইচ্ছা করে। কিন্তু

মুহাম্মাদ ﷺ এর নির্দেশিত পথে তা হয়না। নাবী ﷺ বলেছেন কিছু লোক হবে যারা কোরআন পাঠ করবে কিন্তু তাদের গলদেশে পৌছবে না। আল্লাহর কসম মনে হয় এই দলের অধিকাংশই হচ্ছ তোমরা। আমর ইবনে সালাম বলেন এদের অধিকাংশকে নাহবাওয়ান যুদ্ধেঅস্ত্র প্রয়োগ করতে দেখা গেছে এবং তারা খারেজীদের সাথে ছিল। (দ্বারমী, হাদীস নং ২১০)

(গ) একদা এক ব্যক্তি আনাস এর পুত্র ইমাম মালেক (রহ) এর নিকট এসে বলল, আমি কোথায় এহরাম পরব। তদুত্তরে তিনি বললেন মীক্বাত থেকে যা রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্ধারণ করেছেন, তুমি সেখান থেকে এহরাম পরবে। এই উত্তর শুনে লোকটি বলল, আমি যদি তার চাইতে দূর থেকে এহরাম পরি? উত্তরে ইমাম মালেক (রহ) বললেন আমি এমন কাজ করাকে জায়েয মনে করি না। তৎক্ষণাৎ সে বলল, আপনি উহা কেন অপছন্দ করছেন, তিনি উত্তর দিলেন তোমার কাছ থেকে ফিৎনা হওয়ার আশংকা করছি। সে বলল কল্যাণের কাজ বেশী করাতে কি এমন ফিৎনা হতে পারে? তৎক্ষণাৎ তিনি উত্তরে বললেন কেননা আল্লাহ তায়ালাহ বলেনঃ

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (النور:٦٣)

অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে, অথবা যন্ত্রণা দায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। (সূরা নূরঃ৬৩) তুমি অতিরিক্ত কল্যাণ নির্ধারণ করলে যা নাবী কারীম ﷺ নির্ধারণ করেননি, এর চেয়ে বড় ফিৎনা আর কি হতে পারে? ইহা একটি উদাহরণ। আর আলেমগণ সর্বযুগে বিদআত প্রত্যাখ্যান করেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

দুইঃ বিদআত পন্থীদের প্রতিবাদে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কর্ম পদ্ধতিঃ

এ ক্ষেত্রে তাঁদের কর্মসূচীর ভিত্তি হচ্ছে কোরআন ও সুন্নাহ। আর তা এমন কর্মসূচী যার বিকল্প নেই। যেহেতু তাঁরা বিদআত পন্থীদের স্বরূপ তুলে ধরেন ও তা খণ্ডন করেন। আর তাঁরা কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণ দেন যে, নাবীর সুন্নাতসমূহকে আকড়ে ধরা অপরিহার্য কর্তব্য এবং তাঁরা এটাও প্রমাণ দেন যে দ্বীনের মাঝে বিদআত করা ও অভিনব পন্থা সংযোজন করা নিষিদ্ধ। আর তাঁরা এই বিষয়ে অনেক গ্রন্থ ও পুস্তিকা রচনা করেছেন। আর তাঁরা আক্বীদার কিতাব সমূহে শিয়া, খারেজী, জাহমিয়াহ, মুতাযিলাহ ও আশায়িরাহ এদের ঈমান ও আক্বীদার মৌলিক বিষয়সমূহে বিদআতী কথা বার্তার প্রতিবাদ করেছেন। আর তারা এ বিষয়ে নির্দিষ্ট

কিতাবসমূহ প্রণয়ন করেছেন। যেমন ইমাম আহমদ জাহমিয়াদের প্রতিবাদে এক খানা কিতাব রচনা করেছেন, যার নাম করণ করেছেন الرد على الجهمية আর অন্যান্য ইমামগণও এ বিষয়ে লিখেছেন- যেমন উসমান বিন সাঈদ আদ দারিমি, আর যেমন শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ ও তার শিষ্য ইবনুল কাইয়্যিম ও শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহ:) ও অন্যান্যরা ও ঐ সমস্ত ফিরকা ও কবর পূজক এবং সূফীবাদীদের প্রতিবাদে অনেক কিতাব রচনা করেছেন। তবে বিদআতীদের প্রতিবাদে বিশেষভাবে যে সমস্ত কিতাব লিখা হয়েছে তার সংখ্যা অনেক। উদাহরণ স্বরূপ কিছু পুর্বেকার কিতাবসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

১ الاعتصام للإمام الشاطبي ইমাম শাতিবীর আক্বীদার উপর লিখা বই।

২। إقتضاء الصراط المستقيم লেখক শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যা এই কিতাবের একটি বড় অংশ জোড়ে বিদআতীদের প্রদিবাদ করা হয়েছে।

৩। إنكار الحوادث والبدع ইবনু ওয়্যাহ বিদআতকে অস্বীকার করে লিখেছেন।

৪। الحوادث والبدع লেখক তারতুশী।

৫। الباعث على إنكار البدع والحوادث লেখক আবু শামাহ।

আর বর্তমান যুগের কিতাবসমূহ।

১। الابداع في مضار الإبتداع শায়খ আলী মাহফুয।

২। السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات লেখক মুহাম্মাদ বিন আহমদ শুকাইরী আল হাওয়ামিদী।

৩। التحذير من البدع শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায।

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যে সদা- সর্বদা মুসলমান আলিমগণ বিদআতকে অস্বীকার করে থাকেন এবং তারা অনেক পুস্তক পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা, রেডিও বিভিন্ন মসজিদে খুৎবা, অনেক সংগঠন ও বিভিন্ন সভা-সমাবেশের আয়োজন করে, বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে বিদআতকারীদের বিদআতের প্রতিবাদ করেন। ঐসব মাধ্যমসমূহের বিরাট প্রভাব রয়েছে মুসলমানদের সচেতনতা ও নৈতিক উন্নতি সাধন করতে ও বিদআত উৎখাত করতে এবং বিদআতীদের মূল উৎপাটন করতে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রচলিত বিদআতসমূহের কতিপয় উদাহরণ।

যেমনঃ নাবী কারীম ﷺএর জন্ম বার্ষিকী পালন করা।

২। বিভিন্ন স্থান ও স্মৃতি চিহ্ন এবং মৃত ব্যক্তি ইত্যাদি থেকে বরকত হাসীল করা।

Contents

৩। ইবাদতের ক্ষেত্রে ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে বিদআত করা।

নিম্নোক্ত কারণে প্রচলিত বিদআতের সংখ্যা অনেক। তা হলঃ বিধি বিধানের কাল দীর্ঘায়িত হওয়া, ধর্মীয় জ্ঞান কমে যাওয়া, বিদআত ও ইসলামের বিরুদ্ধাচরণের দিকে আহবানকারীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া এবং কাফিরদের অনুকরণ ক্রমাগত তাদের (মুসলমানদের) অভ্যাস ও আচরনে প্রবেশ করা। এ কথার সত্যতা প্রমাণে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণীঃ

لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

অর্থাৎ আমি আশংকা করছিঃ তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের রীতিনীতি অনুসরণ করবে। (তিরমিজী বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ বলেছেন)

উপরোল্লিখিত বিষয়সমূহ নিম্নে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হলো:

১। রবিউল আউয়াল মাসে নাবীর জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠান করা:

আর এটা খ্রিষ্টানদের অনুষ্ঠানের অনুকরণ, যাকে ঈসা عليه السلام এর জন্ম বার্ষিকী নামে অবিহিত করা হয়েছে। তাই অজ্ঞ মুসলমানরা অথবা পথভ্রষ্ট আলিমরা প্রতি বৎসর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ এর জন্ম উপলক্ষে মাহফিল বা অনুষ্ঠান করে থাকে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এ অনুষ্ঠান মসজিদসমূহে করে থাকে। আর কিছু লোক কোন কোন বাড়িতে অথবা ঐ অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত স্থানসমূহে অনুষ্ঠান করে থাকে।

আর উপস্থিত হয় অনেক নেতৃস্থানীয় ও সাধারণ লোক। তারা ঐ অনুষ্ঠান ঈসা ﷺ এর জন্ম বার্ষিকীতে খ্রিষ্টানদের বিদআত কার্যের সাদৃশ্যমূলক করে থাকে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ অনুষ্ঠান বিদআত কার্য ও খ্রীষ্টানদের সাদৃশ্য ছাড়াও নানারকম শিরক ও অসৎকার্য থেকে মুক্ত নয়। যেমন বিভিন্ন ধরনের কবিতা পাঠ করা, যাতে রাসূল ﷺ এর অধিকার মর্মে এমন বাড়াবাড়ির কথা থাকে যাতে আল্লাহকে বাদ দিয়ে স্বয়ং রাসূলকে ﷺ আহবান করা হয় এবং তাঁর কাছে উদ্ধার প্রার্থনা করা হয়, অথচ নাবী কারীম ﷺ তাঁর প্রশংসায় অতিরঞ্জিত ও বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন।

তাই তিনি বলেছেন:

(لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله).

অর্থাৎ তোমরা আমার মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করো না, যেমনি ভাবে প্রশংসা করেছিল নাসারারা মরিয়মের পুত্র ঈসা ﷺ এর। আমি আল্লাহর বান্দা এবং তারই রাসূল ﷺ বল। (বুখারী ও মুসলিম)

الإطراء শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রশংসার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত বা সীমা লংঘন করা। আর কিছু কিছু লোক এমন ধারণা করে যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের অনুষ্ঠানসমূহে উপস্থিত হন। এ ধরনের আক্বীদা রাখা সুস্পষ্ট কুফরী ও হারাম। আর যে সমস্ত অসৎ কার্য এসব অনুষ্ঠানে হয়ে থাকে, তার মধ্যে যেমন উচ্চস্বরে সমবেত কণ্ঠে কবিতা পাঠ করা ও তবলা বাজানো ছাড়াও সূফীদের বিদআতী জিকির আযকারসমূহ পাঠ করা।

আর কখনও কখনও এতে নারী পুরুষের সংমিশ্রণ ঘটে যা ফিৎনার কারণ সৃষ্টি করে এবং অশ্লীল কাজে লিপ্ত করার দিকে টেনে নিয়ে যায়। আর এমনকি এ অনুষ্ঠান যদিও এসব ক্ষতির আশংকা থেকে মুক্তহয়, আর সীমাবদ্ধ রাখে, সমাবেশ করা খানা খাওয়া ও আনন্দ করার উপর যেমনটি তারা বলে থাকে, তবুও ইহা বিদআত নব আবিষ্কৃত। আর সমস্ত নব আবিষ্কৃতই বিদআত, আর প্রত্যেক বিদআতই বিভ্রান্তি ও গুমরাহী। আর অনুরূপভাবে এটা বিকৃতির মাধ্যম, আর এতে এমন অসৎ কাজ ঘটে থাকে যে অসৎ কাজ অন্যান্য অনুষ্ঠানসমূহে ঘটে থাকে।

আমরা বলব: নি:সন্দেহে এটা বিদআত, কেননা কোরআন ও সুন্নাহতে এর কোন ভিত্তি নেই এবং পূর্ব সূরীদের আমলে ও সোনালী যুগসমূহেও এ ধরণের কোন আমলের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়না। এটার সূচনা একমাত্র হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর অনেক পরে হয়েছে, তার সূচনা করেছে শিয়াহ্ ফাতিমীরা। ইমাম আবু হাফস তাজ উদ্দীন আল ফাকিহানী (রহ) বলেনঃ একটি দল বার বার প্রশ্ন করেছে, সমাবেশ মর্মে যেটি, কিছু সংখ্যক লোক রবিউল আউয়াল মাসে পালন করে, তার নামকরণ করে মিলাদ। এরকম মিলাদের ধর্মের মধ্যে কোন দৃষ্টান্ত আছে কি? আর তারা এর স্পষ্ট ও নির্দিষ্টভাবে উত্তর চেয়েছে। আল্লাহর সাহায্য চেয়ে উত্তর দিচ্ছি। এমন মীলাদের ভিত্তি কিতাব ও সুন্নাহতে আছে বলে আমার জানা নেই আর এ উম্মতের আলিমগণ যারা দ্বীনের স্মরনীয় ব্যক্তিত্ব পূর্বসূরীদের আমলকে যথাযথ ভাবে আকড়ে ধরে আছে,

তাদের কারও কাছ থেকে এ ধরনের আমলের কথা বর্ণিত হয়নি। বরং এটা স্পষ্ট বিদআত, যাকে অলস লোকেরা আবিষ্কার করেছে আর পেটুক খায়খুর লোকদের মনের চাহিদা এটাকে মুখ্য সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেছে। (রিসালাতুল মাওরিদ ফি আমালিল মাওলিদ)

আর শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা বলেছেন: অনুরূপ ভাবে কতিপয় লোক ধর্মের মধ্যে নতুন পন্থার উদ্ভাবন করে থাকে, নাবীর জন্ম তারিখ সম্পর্কে লোকদের মাঝে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও হয় তারা খৃষ্টানদের অনুকরণে নাবীর জন্ম উৎসব পালন করে থাকে, নয়তবা নাবীর মহব্বত ও সম্মানার্থে যেটাই হোক, পূর্বসূরীগণ এ ধরণের মীলাদ মাহফিল করেননি। আর যদি এ ধরনের মীলাদ মাহফিল করার কাজটি এতই উত্তম ও সওয়াবের কাজ হত, তবে সালফে সালেহীনগণ একাজ করার জন্য আমাদের চেয়ে বেশী হকদার ছিলেন।

কেননা তারা হলেন আল্লাহর নাবীকে বেশী ভালবাসতেন ও অধিক সম্মান করতেন এবং তারা কল্যাণের কাজে অতি সতর্ক থাকতেন। মীলাদ মাহফিলের মাধ্যমে রাসূল ﷺ এর প্রতি ভালবাসা প্রতিফলিত হয় না। যা করলে ভালবাসা প্রতিফলিত হয়, তা হল, তাঁর নির্দেশের অনুস্মরণ করা। যা কিছু তিনি করতে বলেছেন তা যথাযথ ভাবে পালন করা। তাঁর প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সুন্নাতকে জীবিত করা। তিনি যা সহ প্রেরিত হয়েছিলেন, তা মানুষের কাছে পৌছে দেয়া এবং উহার উপর অন্তর, হাত ও বাকশক্তি দ্বারা জিহাদ করা।

কেননা এটাই ছিল পূর্ববর্তী অগ্রগামী মুহাজির ও আনসার এবং তাদের উত্তম অনুসারীদের একমাত্র পথ । (ইকতিযাউস সিরাতিল মুসতাকীম ২/৬১৫পৃঃ প্রতিপাদক ডঃ নাসির আল আক্বল) সংক্ষেপ্ত।

আর এ বিদআতকে অস্বীকার করে অনেক পূর্বে এবং বর্তমানে অনেক গ্রন্থ ও পুস্তিকা রচনা করা হয়েছে আর এটা বিদআত ও কোন জাতীয় অনুকরণ ছাড়াও অন্যান্য জন্মোৎসব পালন করার দিকে টেনে নিয়ে যায়। যেমন আউলিয়া সম্মানী ব্যক্তিবর্গ এবং নেতা নেতৃস্থানীয় লোকদের জন্ম বার্ষিকী পালন করা। সুতরাং ইহা অনেক অকল্যাণ ও ক্ষতিকর কাজের পথ খুলে দেয়।

২। বিভিন্ন স্থান ও স্মৃতি চিহ্ন এবং জীবিত, মৃত লোকদের নিকট থেকে বরকত হাসিল করা:

অভিনব বিদআতসমূহের মধ্যেকার একটি বিদআত হল সৃষ্টি কুলের নিকট থেকে বরকত হাসিল করা। আর এটা এক ধরনের মূর্তি পূজা এবং অর্থ সঞ্চয়ের কৌশল। এর দ্বারা জীবিকা নির্বাহ কারীরা সরল সহজ মনা লোকদের নিকট থেকে অর্থ উপার্জন করে থাকে।

আর تبرك শব্দের অর্থ বরকত চাওয়া যার অর্থ কোন বস্তুতে কল্যাণ স্থায়ী থাকা ও বর্ধিত হওয়া, বিশ্বাস করা আর কল্যাণের স্থিতি ও তার বর্ধিত কামনা করা, শুধু মাত্র তার কাছ থেকে বৈধ হবে যিনি উহার মালিক এবং তা দিতে যিনি সক্ষম তিনিই হলেন পবিত্র আল্লাহ। তাই তিনি বরকত অবতীর্ণ করেন ও স্থায়ী রাখেন, কিন্তু সৃষ্টিকুল কাউকে বরকত

দিতে ও তা আবিষ্কার করতে পারে না এবং একে স্থায়ী রাখতেও সক্ষম নয়। অতএব বিভিন্ন স্থান ও স্মৃতি চিহ্ন থেকে বরকত হাসীল করা এবং মৃত ও জীবিত ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা বরকত হাসিল করা কোন ক্রমেই বৈধ নয়। কেননা এটা হয় শিরক হবে, যদি এমন ধারণা পোষণ করে যে, ঐ বস্তুটি বরকত দিতে সক্ষম। আর শিরকের দিকে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম হবে, যদি এমন ধারণা রাখে যে নিশ্চয় তার কাছে ভ্রমন করা, তাকে হাত দিয়ে ধারণ করা এবং তাকে স্পর্শ করা আল্লাহ থেকে বরকত হাসিল করার মাধ্যম। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চুল দ্বারা ও থু থু দ্বারা ও তার শরীর থেকে যা কিছু আলাদা হত, তা দ্বারা যে বরকত হাসিল করতেন যেমন অতীতে বর্ণিত হয়েছে। (এই বইয়ের রাসূলের ﷺ ভালবাসা পরিচ্ছেদে) তবে তা ছিল তার জীবদ্দশায় ও তাদের মাঝে তার উপস্থিতির সাথে খাস। একথার প্রমাণ হল সাহাবায়ে কিরাম নাবী কারীম ﷺ এর মৃত্যুর পর তার গৃহ ও কবর থেকে বরকত হাসিল করার ইচ্ছাও করতেন না। অনুরূপভাবে অন্যান্য অলীদের স্থানসমূহে না যাওয়া আরও উত্তম। এমনকি তারা সৎ ব্যক্তি-বিশেষ থেকে বরকত হাসিল করতেন না। যেমন আবু বকর ও উমর ও অন্যান্য সুযোগ্য সাহাবীবর্গ رضي الله عنهم। না তাদের জীবদ্দশায় আর না তাদের মৃত্যুর পর। আর তারা না হিরা গুহায় নামায আদায় করতেন, না দোয়া করতেন। এ উদ্দেশ্য নিয়ে সেখানে কোন দিন যেতেন না।

যে তুর পর্বতে আল্লাহ তায়ালা মূসা ﷺ এর সাথে কথোপকথন করেছিলেন, তারা (সাহাবায়ে কিরাম) সেখানেও নামায ও দোয়া করার উদ্দেশ্য নিয়ে গমন করতেন না। অথবা তারা এ সমস্ত স্থান ব্যতীত অন্যান্য পর্বতেও যেতেন না। যেগুলোকে বলা হয় আম্বিয়া আউলিয়াদের স্থান, এবং আম্বিয়াদের স্মৃতি চিহ্নের উপর গড়ে উঠা পরিদর্শন কেন্দ্রগুলোকেও তারা পরিদর্শন করতেন না। অনুরূপভাবে নাবী কারীম ﷺ মদীনা মুনাওয়ারায় যেই স্থানে সদা সর্বদা নামায আদায় করতেন, পূর্বসূরীগণের কোন এক ব্যক্তি সে স্থানকে স্পর্শ করতেন না এবং চুম্বনও দিতেন না। মক্কা শরীফে যেখানে তিনি ﷺ নামায আদায় করতেন সে স্থানে কেউ স্পর্শ চুম্বন দিতেন না। অতএব তিনি ﷺ তার দু কদম মুবারক দিয়ে যে স্থানে পদাচরণ করতেন ও নামায আদায় করতেন যদি তার উম্মতের জন্য সে স্থানকে স্পর্শ করা ও চুম্বন দেয়া বৈধ না হয় তবে অন্যরা যেখানে নামায পড়েছে ও ঘুমিয়েছে সেখানে কি করে স্পর্শ করা ও চুম্বন দেয়া বৈধ হবে? তাই দ্বীনের আলিমগণ ধর্মের এই ব্যাপারে জানতে বাধ্য হয়েছেন যে ঐসব স্থানে চুম্বন দেয়া ও স্পর্শ করা নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রবর্তিত শরীয়তের মধ্যেকার নয়। (ইক্তেযাউস সিরাতিল মুস্তাক্বীম ২/৭৯৫-৮০২)

৩। ইবাদতের ক্ষেত্রে ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যে বিদআত করা হয়ঃ

বর্তমান যামানায় ইবাদতের ক্ষেত্রে যেসব নতুন নতুন বিদআত এর উদ্ভাবন করা হয়েছে, তার সংখ্যা অনেক। আর

ইবাদতের মূলনীতি হল প্রমাণ ছাড়া যা হবার নয়। সুতরাং দলীল প্রমান ব্যতীত নতুন পন্থার কোন কিছু জিনিষ শরীয়ত হিসেবে গন্য করা বৈধ নয়। আর যার স্বপক্ষে বা সামর্থনে শরীয়তের কোন দলীল প্রমান নেই প্রকৃত ও সত্যিকারে তাই বিদআত। এ যুক্তির প্রমাণে নাবী কারীম ﷺ এর নিম্নোক্ত বাণীটি সামঞ্জস্যপূর্ণঃ

(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد).

অর্থাৎ কেউ যদি এমন কাজ করে, যা আমাদের এই ধর্মে নেই তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে। (সহীহ মুসলিম)

বর্তমান যুগে যেসব ইবাদতের চর্চা চলছে যার স্বপক্ষে শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ভরযোগ্য কোন দলীল নেই । এমন ইবাদতের সংখ্যা অনেক ।যেমন:-

এক: নামাযের নিয়্যত ভাষায় উচ্চারণ করে বলাঃ এভাবে যে আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই নামায পড়ার নিয়্যত করেছি। এ ধরণের নিয়্যত পাঠ করা বিদআত। কেননা এভাবে নিয়্যত করা নাবী কারীম ﷺ এর সুন্নাতের মধ্যেকার নয়। আর এজন্য যে মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السموات وما في الأرض والله بكل شيء عليم ﴾ (الحجرات: ١٦)

হে নাবী ! আপনি বলুন তোমরা কি তোমাদের ধর্ম পরায়নতা সম্পর্কে আল্লাহকে অবহিত করছ? অথচ আল্লাহ জানেন যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে এবং যা কিছু আছে নবমণ্ডলে। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (সূরা হুজরাতঃ ১৬)

আর নিয়্যতের স্থান হল অন্তর, তাই এটা অন্তরের কাজ জিহবার কাজ নয়।

দুই: নামায শেষে সমবেতভাবে যিকির করাঃ বর্তমান যামানায় এটা একটা নতুন পদ্ধতিতে প্রচলিত বিদআত। কেননা শরীয়ত সম্মত যিকির হল যে, সমস্ত যিকির হাদীসে বর্ণিত আছে, তা থেকে একা একা পাঠ করা, আর এটাই একমাত্র শরীয়ত সম্মত বিধান।

তিন: ইবাদত নামে প্রচলিত বিদআতসমূহের আর একটি বিদআত হল, কোন কোন কাজ উপলক্ষে ও দোয়ার শেষে এবং মৃত ব্যক্তিদের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে বলা।

চার: মৃত ব্যক্তিদের উপর মাতম করা ও তাদের উদ্দেশ্যে খানা পাকিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে খানা খাওয়ানো এবং কোরআন পাঠ কারীদের ভাড়া করে এনে কোরআন পাঠের ব্যবস্থা করা। তারা এমন ধারনার বশবর্তী হয়ে একাজ করে যে, এসব কাজ শোক সংতপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানানোর একটি অংশ বিশেষ, অথবা এমন ধারণা পোষণ করে যে, এসমস্ত কাজ মৃত ব্যক্তির উপকারে আসবে। আর উল্লেখিত বিষয়গুলোর পিছনে শরীয়তের কোন মূল ভিত্তি বা দৃষ্টান্ত নেই। ইবাদাত নামে আরো অনেক কাজ প্রচলিত আছে এবং অনেক ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে যার স্বপক্ষে আল্লাহ তায়ালা কোন দলীল অবতীর্ণ করেননি।

পাচ: ইবাদত নামে আরো কিছু বিদআত হলোঃ ধর্মীয় কোন বিষয় উপলক্ষে মাহফিল বা অনুষ্ঠান করা। যেমনঃ ইসরা,

মেরাজ ও নাবী কারীম ﷺ এর হিজরতকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠান করা। ঐ সব উপলক্ষে এ ধরনের অনুষ্ঠান করার ব্যাপারে শরীয়তের মধ্যে কোন প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত নেই। আর উপরে বর্ণিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত কতিপয় বিদআতঃ যেমন রজব মাসে উমরা রজবীয়া নামে উমরাহ পালন করা হয়, আরও কোন কোন নির্দিষ্ট ইবাদত যা এ মাসে করা হয়, যেমন নির্দিষ্ট করে নফল নামায আদায় করা, নফল সিয়াম পালন করা , এসবই বিদআত। কেননা ইবাদতের দিক দিয়ে অন্যান্য মাসের চেয়ে রজব মাসের আলাদা কোন বৈশিষ্ট নেই। না উমরাহ পালনে, না নফল রোযা পালনে, না নামায আদায়ে, আর না সে মাসে কুরবানীর উদ্দেশ্যে পশু জবেহ্ করাতে ইত্যাদি।

নানান প্রকার সূফীবাদী যিকর আযকার। এ ধরণের আযকার প্রত্যেকটাই বিদআত ও নব আবিস্কৃত জিনিষ। কেননা তাদের বানানো যিকিরের শব্দ চয়ন, উচ্চারণ ভঙ্গী এবং যিকিরের জন্য সময় বেছে নেয়া প্রত্যেকটাই শরীয়ত সম্মত যিকিরসমূহের স্পষ্ট পরীপন্থী।

১৫ই শাবানের রাতকে নামাযের মাধ্যমে কাটানোর জন্য বেছে নেয়া ও ঐ দিনটিকে রোযা পালনের জন্য বেছে নেয়া। কেননা নাবী কারীম ﷺ থেকে এ বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কোন প্রমাণ আসেনি।

ইবাদাত নামে প্রচলিত বিদআতের অংশ হিসেবে উল্লেখযোগ্য যে কবরের উপর ঘর নির্মাণ করা ও তার পার্শ্বে নামাযের জন্য মসজিদ হিসেবে তাকে গ্রহণ করে নেয়া এবং বরকত হাসিলের নিমিত্তে সেখানে যিয়ারত করা ও বিভিন্ন সুখ সুবিধার

জন্য মৃত ব্যক্তিদেরকে মাধ্যম বানিয়ে নেয়া ইত্যাদি, কত রকম শিরকী উদ্দেশ্যে। আর নারীদের কবর যিয়ারত করা। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ কবর যিয়ারত কারীনী মহিলার প্রতি ও তাকে মসজিদে রূপান্তর কারীদের প্রতি এবং যারা কবরে বাতি জ্বালায় তাদের সবার প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন।

পরিশেষে আমাদের কথা: নিশ্চয় বিদআত কার্য কুফরী কাজের সংবাদ বাহক। আর এটা ইসলাম ধর্মের মাঝে অতিরিক্ত জিনিষের সংযোজন, যেটাকে মহান আল্লাহ বিধান হিসেবে বৈধ করেননি এবং তার রাসূল ﷺ এ বিষয়টিকে শরীয়তের কাজ হিসেবে গ্রহণ করেননি। এমনকি বিদআত কার্য মহা পাপ অপেক্ষা ক্ষতিকর। আর মহা পাপ কাজে শয়তান যে অনন্দ পায়, তার চেয়ে অধিক আনন্দ পায় বিদআত করা হলে। কেননা একজন পাপী ব্যক্তি কোন অসৎ কাজকে পাপ জেনেই করে। অতঃপর সে তা থেকে তাওবা করে সে কাজ থেকে নিজেকে ফিরিয়ে নেয়। অপরপক্ষে একজন বিদআতকারী ধর্মের মাঝে নতুন পন্থার উদ্ভাবন করে এবং তা ধর্মের কাজ মনে করেই তা করে, এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার আশা করে। তাই সে, সে কাজ করা থেকে ফিরে আসে না। আর জেনে রাখা দরকার যে, দ্বীনের মাঝে যত বিদআতের উদ্ভাবন করা হবে, সে পরিমাণ সুন্নাতের বিলুপ্ত হবে। আর বিদআতীদের অন্তরে সুন্নাতের উপর আমল করা ও সুন্নাতের ধারকদের মর্মে ঘৃণা সৃষ্টি করে দেয়। বিদআতের আরেকটি ক্ষতিকর দিক হল যে, আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং তার অসন্তুষ্টি ও তার

শাস্তি অপরিহার্য করে দেয় এবং আত্মাসমূহকে সত্য ভ্রষ্ট করার ও সেগুলোকে বিপর্যয়ে ফেলার মাধ্যম সৃষ্টি করে দেয়।

বিদআতীদের সাথে কিরূপ আচরণ করা উচিৎ

বিদআতীর কার্যক্রম অস্বীকার করা এবং তাকে সৎ উপদেশ দেয়া ব্যতীত তার নিকট যাওয়া তার বৈঠকে বসা হারাম। কেননা তার সাথে মেলামেশা করা হলে মেলামেশাকারীর উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে এবং তার শত্রুতা অন্যের কাছে ছড়াবে। আর যখন তাদের শক্তিকে ও তাদের বিদআতী কর্ম তৎপরতাকে প্রতিরোধ করতে পারা যাবে না, তখন তাদের থেকে এবং তাদের ক্ষতি থেকে সতর্ক থাকা অপরিহার্য কর্তব্য। আর যদি একক ভাবে তা করা সম্ভব না হয়, তবে মুসলিম আলিমগনের ও তাদের মধ্যেকার ধর্ম বিষয়ক নেতৃবৃন্দের উপর কর্তব্য হবে বিদআত কাজকে বন্ধ করা ও বিদআতীদেরকে প্রতিরোধ করা এবং তাদেরকে তাদের ক্ষতি হতে রক্ষা করা। যেহেতু ইসলামের উপর তাদের ক্ষতি মারাত্মক ভয়ংকর। তারপর জেনে রাখা কর্তব্য যে, সমস্ত অমুসলিম দেশ বিদআতীদেরকে তাদের বিদআত প্রচার ও প্রসারে উৎসাহ প্রদান করছে, আর তাদেরকে এ কাজ প্রচারে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সাহায্য করছে। কেননা এতে উদ্দেশ্য হল ইসলামকে ধ্বংস করা এবং তার আসল রূপকে বিকৃত করা।

আমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি তার সত্য দ্বীনকে যেন সাহায্য করেন, আর তার শাশ্বত বাণীকে সমুন্নত
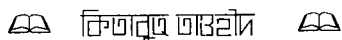
করেন এবং তার শত্রুদেরকে লাঞ্ছিত- অপমানিত করেন। আর আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর পরিবার পরিজন এবং তার সাহাবায়ে কিরামদের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

আমীন ।

Contents

কিতাবুত তাওহীদ

Contents

Contents

Contents

من أهداف المكتب

١- تعريف غير المسلمين بدين الإسلام ودعوتهم إليه، وترغيبهم فيه، مشافهة، ومراسلة، واستماعا.

٢- تصحيح عقائد المسلمين وتنقيتها من الشرك وشوائبه.

٣- نشر العلم الشرعي بين الجاليات المسلمة.

٤- توعية المسلمين وتوجيههم وإرشادهم إلى ما يصلح الحال ويسعد المآل.

٥- الدعوة إلى ترك البدع والخرافات الموجودة عند بعض المسلمين.

المملكة العربية السعودية

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الديرة

تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ص.ب ١٥٤٤٨٨ - الرياض ١١٧٣٦ - تقاطع شارع الريس مع شارع عسير

هاتف ٤٣٩١٩٤٢ - ناسوخ ٤٣٩١٨٥١

حساب رقم ٩٣٤٠ / ٤ شركة الراجحي المصرفية فرع سلطانة

The Cooperative Office for Call & Guidance
to Communities at Western Diraah

P.O.Box:154488 - Riyadh 11736 - Tel:4391942 - Fax:4391851